ঋষি-কথা

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

ঋষি পরিচয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
গুরু নানকজী	৪
মহর্ষি গালব, দ্রৌপদী ও পরশুরাম	৩১
ঋষি মার্কণ্ডেয়	৪০

BANGLADARSHAN.COM

॥গুরু নানকজী॥

আজকে রাসপূর্ণিমা, শাস্ত্রের পুণ্যতিথি আবার আজকে গুরু নানক জয়ন্তী-শিখ ধর্মের প্রবক্তা গুরু নানকজীর পুণ্য জন্মতিথি। তাঁর জীবন, তাঁর দর্শন এবং শিখ ধর্মের কিছু কথাই নিয়ে আজকের এই লেখার মূল উপজীব্য আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিসরে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলাম।

নানক-এটির অর্থ 'ঈশ্বর।' এটি গুরুমুখী হরফে পাওয়া যায়।...ঈশ্বরকে 'অন্তর্দৃষ্টি' বা 'হৃদয়ে'র দ্বারা দেখার উপর নানক জোর দিয়েছেন। গুরু নানকজীর এই ভজন দিয়ে শুরু করলাম "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।"

জাকে হৃদে বসিয়া তু করতি
তাকি তে আস পূজাই
দাস আপনে কো তু বিসরতি নেহি
চরণ ধরি মন ভাঈ।
তেরি আকথ কথা কথনু না জাঈ
গুণ নিধান সুখদাতে স্বামী
সভ তে উঁচ বড়াঈ।
সো সো করম করতা হৈ প্রাণী
জইসিঈ তুম লিখি পাঈ,
সেবক কো তুম সেবা দীনী
দরসনু দেখি অঘাই।
সর্ব নিরন্তরি তুমহি সমানে
জাকৌ তুধু আপি বুঝাই
গুরু পরসাদি মিটিও অজ্ঞানা
প্রগট ভয়ে সভ ঠাঈ
সোঈ জ্ঞানী সোঈ ধ্যানী
সোঈ পরখ সমাঈ
কহে "নানক" জিসু ভয়ে দয়ালা,
তাকো মনতে বিসরি ন জাঈ।

BANGL

১৩৯৮ সালে তৈমুরের আক্রমণের পর বাস্তবিকই সমাপ্তি ঘটে উত্তর ভারতের সংগঠিত সরকার ব্যবস্থার। স্থানীয় রাজ্যপালরা দিল্লির আনুগত্য ত্যাগ করে নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করতে থাকেন। স্থায়ী বিরোধ চলতে থাকে রাজা এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তার মধ্যে। মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যুদ্ধ। রাজকোষ খালি হয়ে যাবার দরুন স্বেচ্ছাচারে বসতে থাকে করের বোঝা। চলতে থাকে ধর্মীয় পীড়ন। রাজনৈতিক হাঙ্গামা জনমনে প্রভাব ফেলে। নতুন অরাজকতায় আবার যেন শুরু হয় বৈষম্যের ধারা।

অথচ কিছুদিন আগেও মুসলিম সুফিবাদ আর হিন্দু ভক্তিবাদের প্রভাবে ঈশ্বরপ্রেমে প্লাবিত হয়েছিল ভারত। একদিকে চৈতন্য ও রামানন্দ, আর অন্যদিকে শেখ ফরিদ উদ্দীন এবং আলি মখদুম হুজুরি। সকল প্রকার বৈষম্য পাশ কাটিয়ে গীত হচ্ছিল মানবতার জয়গান। জেনেছিল, বর্ণপ্রথা স্বর্গীয়ভাবে আদেশপ্রাপ্ত নয়; প্রত্যেক মানুষ সমান। কেবল উপাসনালয় ছাড়া বাকি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুফি আর ভক্ত সম্প্রদায় ছিল অভিন্ন। এবার এমন কাউকে দরকার, যে মন্দির আর মসজিদের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানটুকু পূরণ করবে। সে কাজের দায়িত্ব থেকেই জন্ম নিলেন নতুন আদর্শিক মহাপুরুষ- গুরু নানক,শিখ ধর্মের প্রবর্তক।

“মিথ্যার দুঃশাসনে নম্রতা ও ধর্ম হারিয়ে গেছে। মুসলিম মোল্লা এবং হিন্দু পণ্ডিতেরা দায়িত্ব থেকে করেছে পদত্যাগ। বিবাহের শপথ পাঠ করাচ্ছে শয়তান। হত্যা করা হচ্ছে মানুষ; লোকজন জাফরানের বদলে রক্ত দিয়ে নিজেদের করছে কলঙ্কিত।” (গুরু নানক)

বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত লাহোরের নিকটে অবস্থিত ‘রায় ভর দি তালবন্দী’ গ্রামে, ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দের রাসপূর্ণিমা তিথিতে (মতান্তরে ১৩ই এপ্রিল) বেদী ক্ষত্রী গোত্রের এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামানুসারে তাঁর জন্মস্থানের নাম নানকানা সাহেব নামকরণ করা হয়েছে। তার জন্মস্থানে বর্তমানে শিখদের একটি বৃহৎ উপাসনালয় রয়েছে। উপাসনালয়টির নাম ‘গুরুদুয়ারা জনম আস্থান।’

তাঁর বাবা মেহতা কল্যাণ দাস বেদী (মেহতা কালু নামে পরিচিত), গ্রামের মুসলিম জমিদার রায় বুল্লারেরস ভূমি রাজস্ব বিভাগে কাজ করতেন। নানকের মায়ের নাম তৃপ্তা দেবী এবং তার এক বড় বোন ছিল যার নাম নানাকি। ছেলেবেলায় থেকেই তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান। বয়স পাঁচ হবার পর জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করেন। সাত বছর বয়সে বর্ণমালা ও সংখ্যা শেখানোর জন্য পাঠানো হয় পণ্ডিতের কাছে। পরের দুই বছর মুসলিম আলেমের কাছে থেকে রপ্ত করেন আরবি এবং ফারসি। অবশ্য পড়াশোনায় তার আগ্রহ তেমন ছিল না। পুণ্যবান মানুষের সংশ্রব কিংবা নির্জনতায় একাকী ধ্যানে নিমগ্ন থেকে পার হতো দিন।

তিনি অল্প কিছু লেখাপড়া শিখে প্রথমে স্থানীয় জমিদারীতে কেরানির কাজ শুরু করেন। তাঁর পিতা কালু ছিলেন একজন রাজস্ব আদায়কারী।

বাল্যকালে নানক ফারসি শেখেন এবং কিছুদিন তালওয়ান্দি স্কুলে অধ্যয়ন করেন। পরে স্কুল ছেড়ে তিনি মরুচারী হিন্দু-মুসলিম সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সঙ্গ যাপন করেন। এরপর তিনি বারো বছর বয়সে বাটালার মুল চাঁদ চোনার মেয়ে সুলক্ষ্মণী নামক এক স্থানীয় নারীকে বিয়ে করেন। তাঁর দুই পুত্রের নাম শ্রীচান্দ ও লক্ষ্মীচান্দ। কিছুদিন তিনি জলন্ধর জেলার সুলতানপুরে আফগান প্রধানের হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করেন। সেখানে মর্দানা নামক এক মুসলিম ভৃত্যের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, যে ছিল একজন রবাববাদক। নানক স্তোত্রগীত রচনা করতেন এবং মর্দানা সেগুলিতে সুরারোপ করত। এভাবে দুজনে মিলে স্তুতিগানের একটি সুসংহত রূপ দেন।
সুলতানপুরের মুসলিম চারণ কবি মারদানার সাথে অল্প সময়ের মধ্যেই তার মিত্রতা গড়ে ওঠে। শহরে দু’জন স্তুতিগানের আয়োজন করেন। প্রতি রাতে স্তুতিগান চলত। যারা আসত; তাদের প্রত্যেককে খাবার দেয়া হতো। সূর্যোদয়ের সোয়া এক ঘণ্টা আগে নদীতে গোসল করতেন তারা। তারপর দিনের বেলায় চলত দরবারের কাজ।সেখানে তাঁরা একটি ক্যান্টিন খোলেন যেখানে মুসলিম ও বিভিন্ন বর্ণের হিন্দুরা একত্রে খেতে পারত।

কিছু ঘটনা

******

নয়া জীবন

এমনি এক ভোরে স্নান করতে নেমে দৈববাণী শুনতে পেলেন। তিনদিন তিনরাত নিখোঁজ ছিলেন নানক। মানুষ ধরেই নিয়েছিল, তিনি জলেতে ডুবে মারা গেছেন। কিন্তু চতুর্থ দিন ঠিক ফিরে এলেন এক অন্য নানক। বাড়িতে গিয়েই সবকিছু দান করে দিলেন। দৈববাণীতে শুনতে পেলেন, নানক, আমি তোমার সাথে আছি। তোমার মাধ্যমেই আমার নাম বিস্তৃতি হবে। যারা তোমাকে অনুসরণ করবে; আমি তাদের রক্ষা করব। দুনিয়ায় আমার প্রার্থনা করো; মানুষকে শেখাও কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়। দুনিয়ার রাস্তাগুলোর দ্বারা কলঙ্কিত হয়ো না। জীবনে যাতে নাম, দান, স্নান, সেবা এবং প্রার্থনার প্রশংসা থাকে। তুমি যাকে দয়া করবে, আমি তাকে দয়া করব। যে তোমার প্রতি সদয়; আমি তার প্রতি সদয়।

নানক যোগ দিলেন ফকিরদের সাথে। সাথে ছিলেন পুরাতন বন্ধু মারদানা। একদিন পর নানক দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন,

“কোনো হিন্দু নেই; কোনো মুসলমান নেই।”

BANGLADARSHAN.COM

এরপর তিনি স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে থাকেন।

তখন সম্ভবত ১৪৯৯ সাল, নানকের বয়স ত্রিশ বছর। এবার তিনি দীর্ঘ ভ্রমণে বের হন। প্রথম দফায় মথুরা, বেনারস, গোয়া, বাংলা এবং আসাম। তারপর কিছুদিন পাঞ্জাবের সুফি স্থাপনাগুলোতে। দক্ষিণে তামিলনাড়ু হয়ে শ্রীলঙ্কা, পশ্চিমে মালাবার, বোম্বে ও রাজস্থানের মতো অঞ্চল এবং উত্তরে হিমালয় অঞ্চলের লাদাখ অব্দি। গুরুর শেষ দীর্ঘ ভ্রমণ ছিল মক্কা, মদিনা এবং বাগদাদে।

মক্কায় মুসলিম পীর ও ফকিরদের সাথে আলাপ করতে গেলে তারা তাঁর হাতে গেলাস ভর্তি জল দিয়ে ইঙ্গিতে বোঝান যে সেখানে পীর ফকিরে ভরে গেছে (ভর্তি),আর সেখানে কারো স্থান নেই, দরকার নেই। নানক একটি জুঁই ফুল জলের ওপরে দিয়ে বোঝান যে তিনি এমনি ভেসে থাকবেন সবার সঙ্গে। পীর আর ফকিররা তাঁকে তখন মেনে নেন।

দীর্ঘ ভ্রমণে মারদানা ছিলেন তার সঙ্গী। সাইদপুর হয়ে তিনি যখন ফিরছেন; তখন জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর সে শহর দখলে ব্যস্ত।

এক সময় তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং তাঁর বাণী প্রচার করা শুরু করেন। তিনি প্রচার করেন–”ঈশ্বর কেবল একজনই, তিনিই সত্য, তিনিই স্রষ্টা, তাঁর ভয় নেই, তাঁর ঘৃণা নেই, তিনি কখনও বিলীন হন না, তিনি জন্ম-মৃত্যু চক্রের উর্দ্ধে, তিনি অজ-অমর স্বয়ংপ্রকাশ। সাধনার দ্বারা প্রকৃত গুরুর মাধ্যমেই তাঁকে অনুধাবন করা যায়। তিনি আদিতে সত্য ছিলেন, তিনি কালের সূচনায় সত্য ছিলেন, চিরকালব্যাপী সত্য আছেন এবং তিনি এখনও সত্য।”

একদিন নানক হরিদ্বারে গেলেন। উদীয়মান সূর্যের দিকে গঙ্গাজল উৎসর্গ করছেন তীর্থযাত্রীরা। কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে। নানক নিজে জলেতে নেমে গিয়ে আরো জোরে পানি ছুঁড়তে লাগলেন। সবাই কারণ জানতে চাইলে এবার। গুরু বললেন, “আমার খামার খুব শুকনো; সেখানে পাঠাচ্ছি।" এখান থেকে জল ছুঁড়লে যে খামারে পৌঁছাবে না; একথা বোঝাতে এল তারা। নানক জবাব দিলেন, “আমার খামার তোমাদের মৃত পূর্বপুরুষের চেয়ে কাছে। অত দূরে জল গেলে ওখানে যাবে না কেন?” কথাটা দারুণভাবে প্রভাবিত করে তাদের। আরেকবার নানক মক্কা যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক মসজিদে ঘুমিয়ে গেলেন কা’বার দিকে পা দিয়েই। হঠাৎ এক মোল্লা তাকে ঝাঁকালেন কঠিনভাবে; “কী হে খোদার বান্দা, তোমার পা খোদার ঘরের দিকে। এমন হীন কাজ তুমি কীভাবে করলে?” নানক জবাব দিলেন, "তাহলে পা টা সেদিকেই ঘুরিয়ে দিন; যেদিকে খোদা নেই।”

কর্তারপুরে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি শিষ্য অঙ্গদকে তাঁর উত্তরসূরি মনোনীত করেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষ ব্যাপক জনগোষ্ঠী তার আলোচনা শুনতে হাজির হতো। অনুসারীদের ডাকা হতো শিখ নামে। অনুসারীরা দিন শুরুর আগে উঠেই ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করত। মন্দিরে সমাবেত হয়ে প্রার্থনা ও স্তুতিগান করত। সূর্যোদয়ের সামান্য পর সবাই ছড়িয়ে পড়ত পার্থিব কর্মের জন্য। আবার সন্ধ্যায় মন্দিরে একত্র হয়ে স্তুতিগান শেষ করে ফিরে যেত ঘরে। বিভিন্ন শহরের শিষ্যরাও অনুকরণ করত এই আচার। তাদের জন্যও নির্ধারিত ছিলেন স্থানীয় নেতা।

শিষ্যদের মধ্যে কর্তারপুরে গুরুর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন লেহনা। ক্ষত্রিয় গোত্র থেকে আসা লেহনার ভক্তি ও নেতৃত্বের গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে নানক তাকে ‘অঙ্গদ’ উপাধি দিয়েছিলেন। নানকের নিজের এক পুত্র শ্রী চাঁদ সংসারত্যাগী হয়ে যান এবং অন্য পুত্র আধ্যাত্মিকতায় আকর্ষণ দেখান্নি। যোগ্যতা বিচারে তাই অঙ্গদকেই দায়িত্ব দিয়ে ১৫৩৯ সালের ২২ ডিসেম্বর ভোরে মৃত্যুবরণ করেন নানক। ভোর ছিল তার প্রিয় সময়, ভালোবেসে নাম দিয়েছিলেন ‘অমৃতবেলা।’

রাম সুমির রাম সুমির এহি তেরো কাজ হৈ
মায়া কো সঙ্গ ত্যাগ হরি জু কী সরণ লাগ
জগৎ সুখ মান মিথ্যা ঝুঠো সব সাজ হৈ
সপ্নে যউ ধন পিছন কাহে পর করত মন
বারু কী ভিত তৈসে বসুধা কো রাজ হৈ
নানক জন কহত বাত বিনাসি যাইহে তেরো গাত
ছিন ছিন করি গয়ো কালহা তৈসে জাত আজ হৈ

নানক ছিলেন একেশ্বরবাদী। তাঁর মতে এক ঈশ্বরই সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি ঈশ্বরের একত্ব, মানুষে মানুষে ভেদহীনতা এবং বর্ণপ্রথার অসারত্ব প্রচার করেন। তিনি ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী, কিন্তু মানতেন সব ইষ্টকে।

নানকের আমৃত্যু প্রচেষ্টা ছিল হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করার। মৃত্যুশয্যায় মুসলমানরা দাবি নিয়ে এল, “আমরা গুরুকে কবর দেব।” অন্যদিকে হিন্দুরা বলল, “আমরা দাহ করব।” সমাধান দিতে নানক বলেছিলেন, “তোমরা

আমার দুইপাশে ফুল দাও; হিন্দুরা ডানে এবং মুসলমানরা বামে। যাদের ফুল কাল তাজা থাকবে; তাদের ইচ্ছাই পূরণ হবে।" তিনি তাদেরকে প্রার্থনা করতে বললেন। প্রার্থনা শেষ হলে গুরু তার উপর চাদর টেনে নিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন। পরদিন সকালে চাদর তুলে তারা কিছুই পেল না। দুই সম্প্রদায়ের ফুলগুলোই সতেজ ছিল। হিন্দুরা তাদের ফুলগুলো তুলে নিল, মুসলমানেরা তাদের। পাঞ্জাবে এখনো বলা হয়-

বাবা নানক শাহ ফকির
হিন্দু কা গুরু, মুসলমান কা পীর।

শিক্ষা

নিঃসন্দেহে সুফিবাদ এবং ভক্তিবাদ নানকের মতবাদ প্রচারের ভিত হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু নানকের সাম্যনীতি নিম্ন বর্ণের হিন্দু এবং গরিব মুসলমান কৃষকদের আকৃষ্ট করেছে। তার ব্যক্তিত্ব, সাহসের সাথে বিনয়ের সমন্বয় খুব অল্প সময়েই তাকে জনপ্রিয় করে তোলে। সেইসাথে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড অনুভূতিশীল এক কবি। প্রচলিত প্রথার ঊর্ধ্বে গিয়ে তিনি খুঁজতে চেয়েছেন পরম সত্য। তার ভাষায়–

যখন চুপ থাকি, ওরা বলে আমার জ্ঞান নেই।
যখন বলি, ওরা বলে আমি বাচাল,
যখন বসি, ওরা বলে একজন অনভ্যর্থিত অতিথি থাকতে এল,
যখন চলে যাই, ওরা বলে আমি পরিবার ছেড়ে পালাচ্ছি,
যখন নত হই, ওরা বলে ভয়ের কারণে।
সময় কাটানোর জন্য শান্তিতে কিছুই করতে পারব না,
এখন আপনিই আপনার সেবকের সম্মান রক্ষা করুন, হে প্রভু মহান।

নানক একেশ্বরবাদী। ঈশ্বর নিরাকার হবার কারণে অবতারবাদ এবং ঈশ্বরের পুনর্জন্মকে অস্বীকার করতেন। মূর্তিপূজা অনুমোদন করেননি; কারণ মানুষ মূর্তিকে প্রতীক হিসাবে না দেখে ঈশ্বর হিসাবে দেখে।

মেরে লাল রঙ্গিলে হম লালন কে লালে॥
গুরু অলখ লখাইয়া অবরুনা দুজা ভালে
গুঁড়ি আলাখু লেখাইয়া যা তিসু ভাইয়া
যা প্রভু কিরাপা ধারী
জাগাজীবনু দাতা পুরাখু বিধাতা সহজী মিলে বনবারী
নদরী করহী তু তারহি তারিয়ে
বস এক হু দিন দয়ালা
প্রণবতি নানক দাস নিবাসা তু
সর্বজিয়া প্রতিপালা।

কেবল আধ্যাত্মিক পবিত্রতার মানে নেই; যদি সামাজিক আচরণে তার প্রকাশ না থাকে। তাই শিখকে কেবল বিশ্বাস করলেই হবে না; মিথ্যাচার, প্রতারণা, ব্যাভিচার, অন্য কারো অধিকারে প্রবেশ এবং কাউকে কষ্ট দেয়া

থেকে মুক্ত থাকতে হয়। নানক হিন্দু ও মুসলিমদের ব্যবহৃত নাম 'রাম', 'হরি', 'রব', 'রহিম'কেই ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করেছেন।

কহে রে বন খোঁজন যাই
সরব নিবাসী সদা আলেপা ,তোহী সঙ্গ সময়ই
পুষ্প মধ্য জো বাস বসত হৈ ,মুকার মাহি যশ ছায়ী
তৈসে হী হরি বসে নিরন্তর ঘাট হী খোঁজ ভাই
বাহার ভিতর একে জানো যহ গুরু জ্ঞান বাতাই
জন নানক বিন আপা চিহ্নে মিটে না ভ্রম কী কায়ি

তিনি তাঁর অনুসারীদের শুদ্ধ জীবনযাপন করার পরামর্শ দেন এবং অতিশয় বৈরাগ্য বা সুখভোগ, ভন্ডামি, স্বার্থপরতা ও মিথ্যাবাদিতা পরিত্যাগ করার আহবান জানান। অনুসারীদের প্রতি তিনি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, স্নান, পবিত্র নামজপ এবং প্রাত্যহিক কর্ম ঈশ্বরের নামে উৎসর্গের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকারও উপদেশ দেন।

এরপর থেকে নানা দেশে ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার করা শুরু করেন। নানক তাঁর বাণী প্রচারের জন্য, 'রাবাব' (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) বাদক মুসলমান বন্ধু মারদানাকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চল ভ্রমণ করেন। ভারতের বাইরে আরবের মক্কা, মদিনা, বাগদাদ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় ভাষায় রাবাব বাদনের ছন্দে তাঁর বাণী প্রচার করেছেন। এই পরিভ্রমণকালে তাঁর ধর্মমত প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রচারকেন্দ্রও (মানজিস) স্থাপন করেন।

কথিত আছে যে, ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে গুরু নানক নিজ ধর্মমত প্রচারের জন্য ঢাকা আসেন নানা পথ ঘুরে। ইনি মিথিলা থেকে দিনাজপুরে এসে কান্তজীর মন্দির পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি কামরূপ ঘুরে সিলেটে যান। এরপর সিলেট থেকে তিন ঢাকাতে আসেন নৌপথে। উত্তর ঢাকার শিবপুরে (বর্তমান রায়ের বাজার, ধানমণ্ডি এলাকার কোনো এক স্থানে) নৌকা থেকে অবতরণ করেন। পরে তিনি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যান। শিবপুরের মানুষের পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য সে সময়ের শিবপুর গ্রামের জাফরাবাদ এলাকায় একটি কূপ খনন করিয়েছিলেন। পরে সেখানে বিদেশি অতিথিদের স্নানের সুবিধার্থে এক স্থানীয় শাসক পুকুর খনন করিয়েছিলেন। ১৯৫৯ অবধি সে কূপটি স্থানীয় শিখরা দেখভাল করতেন। পরে আবাসন প্রকল্পের জন্য সরকার জমি বণ্টন করে দিলে পুকুরটি ভরাট করা হয়।

কথিত আছে নানক এর এই কুয়াটি বর্তমানে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ২৬ নং সড়কের ২৭৮ বাড়িতে অবস্থিত। তিনি ঢাকার নীলক্ষেত (তৎকালীন সুজাতপুর মৌজার অন্তর্গত ছিল) অঞ্চলে একটি মাঞ্জি প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় উপদেশ দেন। উল্লেখ্য, পাঞ্জাবি শব্দ মাঞ্জি-র অর্থ হলো– আধ্যাত্মিক আলোচনার কেন্দ্র। পরে এটাই হয়ে ওঠে নানকশাহী গুরুদুয়ারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুরু নানক তাঁর সময়ে লঙ্গরের প্রচলন করেছিলেন। সেখানে সব ধর্মের, সব গোত্রের, সব লিঙ্গের, সমাজের সর্ব স্তরের মানুষেরা পাশাপাশি বসে আহার করেন। দ্বিতীয় শিখগুরু অঙ্গদ দেবের সময় থেকে লঙ্গরে মাংসের ব্যবহার বাতিল করা হয়। তখন থেকে লঙ্গরে নিরামিষ আহার বিতরণ শুরু হয়। ঐতিহাসিকদের মতে

বৈষ্ণবদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্যই এই ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। বর্তমানে প্রতিটি গুরদুয়ারায়ই লঙ্গরের ব্যবস্থা আছে।

১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে জি টি রোডের ধারে এক প্রকাণ্ড জলাশয়ের ধারে, গুরুনানক একটি মন্দির গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। এই সময় তিনি এই জলাশয়ের নাম রাখেন অমৃত সায়র। তার থেকেই শহরের নাম হয় অমৃতসর। গুরু নানক জীবদ্দশায় তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দে শিখ গুরু অর্জুন সিং অমৃত সায়র-এর ধারে স্বর্ণ মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ধারণা করা হয়, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির বা হরিমন্দিরে প্রতিদিন ১ লক্ষ লোককে খাবার দেওয়া হয়। বিভিন্ন মানুষের দানেই এই লঙ্গর চলে। এই লঙ্গরকে বলে, 'গুরু কা লঙ্গর।' আর যাঁদের স্বেচ্ছাশ্রমে এই লঙ্গরগুলো চলে, তাঁদেরকে বলা হয় 'সেবাদার।' মোঘল সম্রাট বাবরের রাজত্বকালে গুরু নানক ও তাঁর মুসলমান বন্ধু মারদানাকে কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। কারা কর্মকর্তার মাধ্যমে গুরু নানক সম্পর্কে জানার পর, সম্রাট বাবর নানককে ডেকে পাঠান এবং তাঁর বাণী শুনে তাঁকে একজন বিশেষ ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মনে করে তাঁকে মুক্ত করে দেন।

১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, বর্তমান ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের করতারপুর নামক স্থানে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কথিত আছে, একদিন নানক তাঁর মুসলমান বন্ধু মারদানার সাথে বাইন নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুব দিয়ে হারিয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

এর তিনদিন পর নানক সবার সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আমি ঈশ্বরের দেখা পেয়েছি, তিনি আমাকে তাঁর প্রেরিত গুরু হিসাবে উল্লেখ করেছেন।'

নানক যখন শ্রীক্ষেত্র পুরীতে যান সেখানে তিনি থাকতেন সমুদ্রতটে, রাজকর্মচারীরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় জগন্নাথ মন্দিরে আরতি দর্শন করতে। নানক মন্দিরে যান, কিন্তু রাজকর্মচারীরা দেরি করতে থাকলে তিনি বেরিয়ে এসে সমুদ্রতীরে আরতি করতে থাকেন বিশ্বপিতার সেই গান দিয়ে:

গগন মে থাল রব চন্দ দীপক বনে,
থারিকা মণ্ডল জনক মতি
ধুপ মালা-আনলো পবন চাবারো করে,
সগল বানারায়ে ফুলন্থ জোতি
কইসি আরতি হোয়ে ভব খাণ্ডানা
তেরি আরতি অনাহত শব্দ বাজন্থ ভেরী
সেহস তব নৈন নানা নৈন হৈ তোহী কো,
সেহাস মুরত নানা এক তোহী
সেহাস পদ বিমল নানা এক পদ গন্ধ বিন,
সেহাস তব গন্ধ এভ চলত মোহী
সভ মে যত যত হৈ সো-ঈ,
থিস ঢাই চাণন সভ মে চাণন হোই
গুর শাখী জোত পারগৎ হোই,

জো থিস ভাবে সো আরতি হোই
হর চরণ কমল মকরন্দ লোভীত-মানো,
আনা দিন মোহে আহ-ঈ পিয়াসা
কিরপা জল দে নানক সারাং কো,
হোই যা -তা তেরে না বাসা।

তাঁর সেই আরতিতে সমস্ত জনগণ আকৃষ্ট হয়ে চলে আসে, তখন রাজকর্মচারীরাও সমাদর করে তাঁর আরতিতে অংশ নিতে থাকেন।

‘গুরু নানক বাণী’

গতকাল গুরু নানকের জন্মোৎসব পালিত হ য়েছে বিশ্বজুড়ে। ভারত ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ গুরু নানকের অমূল্য বাণী ও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকে স্মরণ করেছেন। আসলে গুরু তো তিনিই, যিনি অন্ধকার থেকে টেনে তোলেন। জীবনযাপনের সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। পবিত্র ও সত্ ভাবে বাঁচার প্রেরণা দেন। প্রকৃতি গুরুর মতোই গুরু নানকও শিখিয়েছিলেন কী ভাবে বদ্ধ সংসারেও মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর সেই বাণী, ‘ঈশ্বর আর মানুষ আলাদা নয়। মানুষকে ভালোবাসলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।’ আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে গুরু নানকের সেই বাণীর কয়েকটি মেনে চললেই সংসার জীবনে আনন্দে থাকা যায়।

গরিব মানুষদের কখনও ভুলবে না

''

সমাজে ধনী-গরিব বৈষম্য আজও যেমন প্রবল ভাবে আছে, আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগেও ছিল। গুরু নানকের তখন বয়স ১২ বছর। নানককে তাঁর বাবা ২০টাকা দিয়েছিলেন একটি ব্যবসা করার জন্য। কিশোর নানক ওই টাকায় প্রচুর খাবার কিনে এনেছিলেন এবং গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। যখন নানকের বাবা তাঁকে টাকাটির ব্যাপারে জিগ্গেস করেন, নানকের উত্তর ছিল, এটাই তো সত্যিকারের ব্যবসা। আজও গুরু সচ্চা সওদায় গরিবদের খাবার দেওয়া হয়।

ভগবান এক

''''''''''''''''''''''

একটাই ধর্ম, তা হল মানব ধর্ম। গুরু নানকের কথায়, ‘হিন্দু, মুসলিম বলে কিছু নেই।’ গুরু নানক হরিদ্বার সফরে গিয়ে দেখেন, গঙ্গার জলে নেমে মানুষ সূর্যের দিকে মুখ করে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। তাঁদের বিশ্বাস, পূর্ব দিকে স্বর্গের দ্বার রয়েছে। গুরু নানক গঙ্গার জল নিয়ে পশ্চিমে জলাঞ্জলি দিতে শুরু করলেন। অনেকেই হাসাহাসি শুরু করে দিলেন। কেউ কেউ রেগেও গেলেন। তখন নানকের উত্তর ছিল, যদি তোমাদের ছেটানো গঙ্গাজল স্বর্গে যেতে পারে, তাহলে আমার পশ্চিমে ছেটানো গঙ্গাজল কেন পঞ্জাব যাবে না। পঞ্জাব তো স্বর্গের থেকে কাছে।

নারী-পুরুষ সমান সমান

তিনি দেখেছিলেন, কোনও মন্দির বা মসজিদে মেয়েদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। মনে খুব আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি শিখ সম্প্রদায়ের মহিলাদের মন্দিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

উদার হও

মনকে উদার হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন নানক। বলেছিলেন, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলে আলোর সন্ধান পাবে না। তাই উদার হও।

জীবনের ৫ শত্রু

জীবনে ৫টি শত্রুকে চিহ্নিত করেছিলেন গুরু নানক। অভিমান, রাগ, লোভ, হিংসা ও আকাঙ্খা। সঠিক জীবনের সঠিক পথের জন্যই সঠিক গুরুর প্রয়োজন। নানক বলেছিলেন, তীর্থ ভ্রমণের থেকে ভালো জীবনে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া।

স্বাবলম্বী

নিজের কাজ নিজে করো। কারও সাহায্য ছাড়াই কাজ করার চেষ্টা করো।

কুসংস্কার

কুসংস্কারকে দূর হঠাও কোনও কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিও না। কারণ কুসংস্কার মানসিক ভীতি তৈরি করে। জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

সারল্যই সৌন্দর্য

শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য গুরু নানক মাত্র ৩টি শপথ নিতে বলেছিলেন। বন্ধ চাকো, অর্থাত্ সকলের সঙ্গে মেলামেশা করো, কিরাত করো অর্থাত্ সত্ জীবনযাপন করো ও নাম জাপনা বা ঈশ্বরের নাম জপো।

ভ্রমণ করো

''''''''''''''''''''

মানসিক বিকাশের জন্য ভ্রমণের বিকল্প নেই। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াও। নানকের জীবনী, কর্ম , বাণী ও অবদানের কথা এক বিরাট সমুদ্রের মত গভীর ও বিশাল যার ওপর সম্পূর্ণরূপে লেখা বা বলা সহজ নয়। এখানে মধ্যকালীন ভারতের এই মহান সাধক, জ্ঞানী, মানবদরদী, ঈশ্বরাভিমুখী পরিব্রাজক বিশাল মনীষীর কিছু মহত্বপূর্ণ বাণীর উল্লেখ করে নিজের মন ও লেখনীকে পবিত্র করতে চাই। নানক স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি তাঁর মাতৃভাষা পঞ্জাবী ছাড়াও হিন্দি, ফারসী, সংস্কৃত, উর্দু ব্রজবুলি ও আরো কিছু ভাষা জানতেন, যার ফলে তাঁর পরিব্রাজক জীবনে সারা ভারত ঘুরে ঘুরে এবং ভারতের বাইরেও পশ্চিম এশিয়ার কিছু দেশ এবং সিংহলে গিয়ে মিশ্রিত শব্দসম্বলিত যে ভাষার মাধ্যমে গীত ও দোহাবলির মাধ্যমে নিজের আধ্যাত্মিক বিচারধারার প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বাণী যে পঞ্জাবি বোলিতে রচনা করেছিলেন তার নাম “গুরুমুখী” দেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তৎকালীন সুফী সন্তদের মতই নানকও বেশির ভাগ সময় গান গেয়ে গেয়ে নিজের সিদ্ধান্ত ও বিচারের প্রচার, প্রসার করেছিলেন আর তাঁর সঙ্গে ভাই মর্দানা নামের তাঁর এক শিষ্য রাবাব নামের একটি তারের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সঙ্গত করতেন ।
গুরু নানকের রচিত আধ্যাত্মিক সুললিত ছন্দের রচনাগুলি সবশুদ্ধ দুইসহস্র নয় শত ঊনপঞ্চাশটি “বান্দ”, কয়েক সহস্র “সবদ কীর্তন”, “দোহা”, “পদ”, “অষ্টপদী”, ইত্যাদি ভাগে “আদিগ্রন্থ”, অর্থাৎ “গুরু গ্রন্থ সাহেবে” চতুর্থ গুরু রামদাস কর্তৃক সংকলিত করা হয়েছিল। সেই সমস্ত রচনা দিনরাতের অনুসারে গুরু নানক প্রায় উনিশটি “রাগে” গাইতেন ও সেই রকমই গাইবার বিধান দেন। বিভিন্ন ঋতুর মধ্যেও নানক পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব করে “বারহ মাহা” নাম দিয়ে সেই অনুসারে সঙ্গীত সৃষ্টি করে সেই মহান সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর নানকের ভক্তিরসে ওতপ্রোত ও আধ্যাত্মিক রহস্য তত্ত্বে পূর্ণ নানক বাণীর গভীর প্রভাব পড়েছিল তার পরিচয় অনেক রবীন্দ্র সঙ্গীতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির প্রত্যেকটি তত্ত্বে গুরু নানকের মতই রবীন্দ্রনাথও ঐ পরমপিতার, যিনি “এক” অদ্বিতীয়, “ওঁ” কার তাঁকে অনুভব করতে পারতেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে গুরু নানকের প্রথম ও প্রমুখ বাণী হল যে তিনি–

“ওঁঙ্কার সতনাম কর্তা পুরখ নির্ভয় নির্বৈর
অকাল মূরতি অযোনি সৈভম গুরপ্রসাদি”

অর্থাৎ ঈশ্বর কেবল মাত্র “এক”, ওঁ শব্দ, যাঁর থেকে বিশ্বের উৎপত্তি, তিনিই একমাত্র সত্য, “নাম”, তিনিই একমাত্র কর্তা, তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, মহান শক্তির এবং সব শক্তির আধার ও নিয়ন্ত্রক। তিনি নির্ভীক, শত্রুহীন, দেহধারী নন অর্থাৎ নিরাকার, নির্গুণ,ত্রিকালের অধিপতি সদা বর্তমান, তিনি কোনও নারীর গর্ভ থেকে জন্মান নি তাই অযোনিসম্ভব, বরং স্বয়ম্ভূ, কেবলমাত্র গুরু কৃপা হলেই তাঁকে লাভ করা যায়।”

আবার গুরু নানক এক জায়গায় বলেছেন যে এই ঈশ্বর হলেন “সৎ, শ্রী, অকাল” অর্থাৎ একমাত্র সত্য, সুন্দর এবং সময়ের বা কালের অধিপতি, তার অধীনে নন।

গুরু নানক তাঁর শিষ্যদের বোঝাতেন যে “পরমপিতা ঈশ্বর কখনও ক্রুদ্ধ হন না বা ভয়ঙ্কর নন যেমন কিছু অজ্ঞ এবং লোভী ব্রাহ্মণ প্রচার করতেন। বরং ঈশ্বর করুণাময়, ক্ষমাশীল। তিনি ভক্তের জাত, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় ও

লিঙ্গ দেখেন না, তিনি ভক্তের হৃদয়ের ভাষা বুঝতে পারেন এবং ভক্তের হৃদয়ের প্রেম, ভক্তি, সততা, পবিত্রতা, সরলতা এবং একনিষ্ঠতা দেখেন, কোনো বাহ্যিক উপাচার, আড়ম্বর, শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান দিয়ে তাঁকে আকৃষ্ট করা যায় না।

গুরু নানকের অনুসারে কোনো বেদ, শাস্ত্র, কোরান ইত্যাদি পড়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না, অন্তর্মুখী হয়ে তাঁকে সেখানে খুঁজতে হবে এবং তাঁকে পাবার একমাত্র উপায় হল শুদ্ধ মনে সর্বদা, কাজের মাঝেও তাঁর "নামজপ" করে যাওয়া। সন্ত কবিরের মতই নানকও "সহজ যোগ" বা "সহজ সাধনা" র পথ কেই একমাত্র সরল ও ব্যবহারিক আধ্যাত্মিক সাধনার পথ বলেছেন, যার অনুসারে "নামজপ" করে যাওয়াই ঈশ্বর আরাধনা, আর কোনো কর্মকান্ডের প্রয়োজন নেই, সেসব হল নিজের মনে সন্তোষের জন্য, ঈশ্বরের ওসবের প্রয়োজন নেই, ওঁর তো কেবল ভক্তের নিশ্ছল, অবিচল প্রেমে ভরা হৃদয়টি চাই।

গুরু নানকের আধ্যাত্মিক বিচার প্রধানত "বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত আধারিত ছিল যার সহজরূপ আমরা শ্রীমদভাগবদ্গীতায় পাই। সেই অনুসারে এই সমগ্র পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রতিই সমভাবপূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে ও সমানভাবে সকলকে ভালবাসতে হবে। গুরু নানকের শব্দগুলি খুবই হৃদয়স্পর্শী। পরমেশ্বরের শাশ্বত, একক, চিরন্তন, অনাদিরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন;

BANGLADARSHAN.COM

"আপে পটি কলম আপি উপরি লেখ ভি তুসি
একা কহেরাই নানকা দুজা কহা কুল পণ্ডি"

অর্থাৎ হে প্রভু! তুমিই খড়ি, তুমিই স্লেট, স্লেটের ওপরে লেখা লিপিও তুমি। তুমি "একমাত্র এক" আর তুমি ব্যতীত দ্বিতীয় কেউই নেই।

নানক চারিদিকে সব বস্তুতেই সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতেন আর তাঁর মনে হত যে প্রকৃতির সবকিছু যেমন আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, গ্রহ নক্ষত্র, ধরণী সবকিছুই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরেরর মহিমাগাথা গেয়ে চলেছে, তাঁর সেবা করছে, তাঁর উপাসনা করছে। একবার তিনি ঘুরতে ঘুরতে উড়িষ্যার সমুদ্রতীরের পুরী শহরে গিয়ে পৌঁছানোর যেখানের প্রভু জগন্নাথের মন্দির বিখ্যাত। তাঁকে কেউ খুব অনুরোধ করেন যে তিনি যেন অবশ্যই সন্ধ্যাবেলা জগন্নাথ মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় যান সেখানের মনোমুগ্ধকর সহস্র প্রদীপ দিয়ে প্রভুর আরতি দেখে নিশ্চিত মুগ্ধ হবেন। নানক গেলেন আরতি দেখতে কিন্তু কিছুক্ষণ দেখার পর মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে খোলা আকাশের নীচে গিয়ে বসেন। সেই ভক্তি এসে জিজ্ঞেস করল তাঁর আরতি মাঝখানেই চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবেগে এই গানটি তৈরী করে গাইতে লাগলেন যার কথাগুলি অতি সুন্দর, এবং অর্থবহ;

"গগন মৈঁ থাল, রবি চন্দ দীপক বসাই,
তারিকামণ্ডল জনক মোতি/
ধূপ মলয়ানিল, পবন চাবর করেই ,
সাগর বনরাই ফুলন্তা জোতি//
কৈসী আরতি হোই ভাবখণ্ডন তৈরি আরতি/
অনাহত, শবদ বাজত ভেরী//"

অর্থাৎ গগনরূপী বিশাল থালায় সূর্য, চন্দ্র রূপী প্রদীপ সাজিয়ে, তারামণ্ডলের মোতি দিয়ে সেটি সাজিয়ে কেউ যেন অনাদিকাল থেকে তাঁর আরতি করে চলেছে, মলয় বাতাস সুগন্ধিত ধূপের গন্ধ ছড়াচ্ছে, পবন চামর দোলাচ্ছে, কি অদ্ভূত আরতি হচ্ছে, অনাহত শব্দের ভেরীতে জয়ঘোষ হচ্ছে।

এইভাবে তৎক্ষণ শবদ কীর্তন রচনা করে উনি গাইতেন যা ভক্তদের হৃদয়ের স্পর্শ করত।

সুফীদের প্রেম পূর্ণ ঈশ্বর আরাধনার সঙ্গে নানকের মতের মিল ছিল।

গুরু নানক কেবল আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, সামাজিক এবং নীতি বিষয়ক উপদেশও কাব্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে দিতেন যা মানব সমাজের চিরকালের অমূল্য, সম্পদ।

গুরু নানক পূর্ণরূপে নিরাকার, নির্গুণ, স্বয়ম্ভূ, পরম শক্তিশালী, সর্বত্রবিদ্যমান, সদা বর্তমান, সমস্ত জ্ঞানের স্রোত এক জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর সেই মহিমা প্রচার করে গেছেন। পরমেশ্বরকে তিনি "কর্তা পুরখ" অর্থাৎ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা এবং "সদগুরু বলেছেন।" মানব দেহধারী গুরুগণ সেই সদগুরুর কৃপায় ভগবদ্ জ্ঞানলাভ করে শিষ্যদের সেই জ্ঞান দান করেন। সেই মহান পবিত্র 'জ্যোতি" থেকেই কোটি কোটি জ্যোতির সমান বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন রকমের প্রাণীর জন্ম হয়, যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মানুষ কারণ একমাত্র মানুষই ঈশ্বরের চিন্তা করার ও তাঁর আরাধনা করার সামর্থ্য পেয়েছে।

"জ্যোত সে জ্যোত জগাও

পরমেশ্বরের কাছে সবাই সমান–তিনি "নির্ভয়" ও "নির্বৈর", অর্থাৎ কারুরই মিত্র বা শত্রু নন, পক্ষপাতহীন। গুরু নানক নিজের অনুগামীদের "সিখ" বা শিখ অর্থাৎ শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন এবং আধ্যাত্মিক পথে চলতে গেলে একজন শিষ্যের মনে কোনো সন্দেহ না রেখে সম্পূর্ণ রূপে নিজের মানব গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে দিতে হবে, ঠিক যেমন "গীতা"য় বলা হয়েছে। এইভাবে নানক ভারতবর্ষের প্রাচীন "গুরুশিষ্য পরম্পরাকে খুব মহত্ব দিয়েছেন। গুরুকেও এমন হতে হবে যিনি শিষ্যের কাছ থেকে কোনো কিছু না নিয়ে সব জ্ঞান অকৃপণভাবে দান করবেন।

"সিখ কো ঐসা চাহিয়ে, গুরু কো সব কুছ হয়ে
গুরু ভি ঐসা চাহিয়ে, সিখ কা কুছ না লায়ে।"

গুরু নানক তৎকালীন হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে যেসব ধার্মিক ও সামাজিক গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, লোকদেখানো আড়ম্বর এবং প্রকৃত ধর্ম বিষয়ক অজ্ঞানতা, যন্ত্রবৎ শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান মানা, আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং মুসলিম মোল্লাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল স্পষ্টভাবে, নির্ভীকভাবে সেইসব কুরীতির ও কুপ্রথার খোলাখুলি প্রতিবাদ করে বেড়াতেন এবং কাব্যিক ছন্দে নিজের সেইসব কথা বলতেন এবং তার লিখিতভাবেও প্রচার করতেন। নানক তৎকালীন প্রশাসকদের অন্যায় অত্যাচার, শোষণ এবং পক্ষপাতিত্বেরও স্পষ্ট প্রতিবাদ করতেন। হিন্দুদের সামাজিক ভেদাভেদ, জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি, অস্পৃশ্যতার ধারণা ও ব্যবহার, কুরীতি, কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল একই 'খোদা'র তৈরী হিন্দু আর মুসলমান যেমন "ভাই ভাই", তেমনই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবাই সমানরূপে শুদ্ধ কারণ তারা সবাই সেই একই "নুর" বা "জ্যোতি" অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ। নানক এক মহান দেশপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক, মানবদরদী, সমানতাবাদি, ঐক্যবাদি ছিলেন।

গুরু নানকের মতে একজন মানুষের অর্থাৎ "জীবাত্মার" মধ্যে ক্ষমা, ধৈর্য, প্রেম, সদ্ভাবনা, সহানুভূতি, দয়া, ত্যাগের ভাবনা, নিঃস্বার্থভাব, ঈর্ষা-দ্বেষহীনতা, নিরহংকার, সাহস, আত্মবিশ্বাস, নির্ভীকতা, বিনম্রতা, জ্ঞানের জন্য আকুলতা , গুরুভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণভাবযুক্ত প্রেম ও ভক্তি, সেবাভাব এবং সদাচারিতা থাকা প্রয়োজন, তবেই সে একজন প্রকৃত মানব হতে পারবে ও প্রকৃত "সিখ" হতে পারবে। আমরা এখনকার সিখেদের যে পাগড়িতে ঢাকা কেশ, কৃপাণ, কড়া ইত্যাদি দেখি সেসব নিয়ম শিখেদের অন্তিম গুরু গোবিন্দসিংজি শিখেদের মুগল আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই জন্য বিশেষ যোদ্ধাজাতি বা "খালসা" বানাবার জন্য করেছিলেন। গুরু নানক শিখেদের অন্তরে পরিবর্তন এনে প্রকৃত আদর্শ মানবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, কোনো বাহ্যিক বিশেষত্ব দিয়ে নয়।

নানকের উপদেশ ছিল প্রাণায়ামদ্বারা নিজের মনকে শান্ত করে ভক্ত যেন ঈশ্বরের ধ্যান করে এবং নামজপ করে আর কোনো বিধিবিধান পালনের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের কোনো রূপ নেই, তিনি নির্গুণ কাজেই নানক মূর্তিপূজার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি সন্যাস নেওয়ার ফলে যে সাধারণত মানুষের মনে অহংকার জন্মায়, নিজেকে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, সেই বিষয়ে সাবধান করে দেন। পাঞ্জাবে নিজের বাড়িতে থাকলে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে এক সাধারণ গৃহস্থেরই জীবনযাপন করতেন, আবার পরিব্রাজকরূপে বেরিয়ে পড়তেন। শিখধর্ম গৃহস্থের ধর্ম যা মানুষকে সুন্দর স্বভাব চরিত্র নিয়ে সুখী জীবনযাপন করতে শেখায়।

নানকের মতে একমাত্র "সন্তোখ" অর্থাৎ মনের সন্তোষই মানুষকে সুখী করে, সৎপথে থেকে উপার্জন করলে মনে শান্তি লাভ করা যায়। আড়ম্বর ও ভণ্ডামি থেকে দূরে থেকে সরল ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরের নামজপ বা নামগান করাই পূজা বা উপাসনা। যে মানুষ ত্যাগ, দয়া, দান, সেবা, পরোপকার করে সেই ঈশ্বরের প্রিয় হয়, অনেক উপাচার দিয়ে পূজা করলে নয়। তিনি বলেছেন,

"অন্তরই বসাই, না বাহারি যাই
অমৃত ছোড়া, কাহে বিষ খাই//"

গুরু নানক বার বার অন্তর্মুখী হয়ে গুরুমুখী হতে বলেছেন (এখানে গুরু মানে ঈশ্বর)।

গুরু নানক যদিও মধ্যকালীন ভারতের "ভক্তি আন্দোলন যুগের" এক অগ্রগামী মনীষী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন কিন্তু সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর অনেক অবদান ছিল। তিনি তাঁর "সিখ" ভক্তদের মধ্য থেকে জাতিব্যবস্থা, নানা রকমের হিন্দু আচার অনুষ্ঠান, বিধি নিষেধ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির দূর করে দেন এবং একসঙ্গে সকলের পংক্তিভোজন বা "লংগর" প্রথা চালু করেন। ওঁদের বিবাহপ্রথাও খুব সহজ হয়ে যায় এবং সামর্থ্য অনুসারে সেবা ও পরোপকার আবশ্যকীয় করা হয়। সীমিত স্থানে হলেও, নানক এই ভাবনার প্রসার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কেউ ছোট নয়, ধনী- দরিদ্র, জাতপাত নির্বিশেষে সবাই সমান এবং জয়ধ্বনি কেবল একমাত্র সত্য, পরমেশ্বরের নামেই দেওয়া চলে।

"বলে জো নিহাল, সৎ শ্রী অকাল।"

বলা হয় যে নানক এশিয়া জুড়ে বহুদূর ভ্রমণ করে মানুষকে ঋক ওঙ্কার (ੴ, এক ঈশ্বর) বার্তা শেখান, যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে বাস করেন এবং চিরন্তন সত্য গঠন করেন। এই ধারণার সাহায্যে, তিনি সাম্য, ভ্রাতৃপ্রেম, মঙ্গল এবং গুণের উপর ভিত্তি করে একটি অনন্য আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করবেন।

নানকের শব্দগুলি শিখ ধর্মের পবিত্র পাঠ গুরু গ্রন্থ সাহিব-এ 974টি কাব্যিক স্তোত্র বা শব্দের আকারে নিবন্ধিত হয়েছে গুরুমুখী ভাষায়, কিছু প্রধান প্রার্থনা হল জপজি সাহেব (জাপ, 'আবৃত্তি করা'; জি ও সাহেব প্রত্যয়) সম্মান বোঝায়); আশা দি ভার (আশার গান); এবং সিদ্ধ গোষ্ট (সিদ্ধদের সাথে আলোচনা)। এটি শিখ ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ যে নানকের পবিত্রতা, দেবত্ব এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের চেতনা পরবর্তী নয়টি গুরুর প্রত্যেকের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল যখন গুরুত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়েছিল।

শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব-এ গুরু নানকের বাণী ও স্তোত্রগীত সংকলিত রয়েছে। ১৫৩৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। [সমবারু চন্দ্র মহন্ত]নানক শিখধর্মে হিন্দু ও মুসলিম চিন্তাধারার সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর উত্তরসূরি অন্য নয়জন গুরুর মধ্যে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ হলেন গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৬৬-১৭০৮)।

ভক্ত এবং সুফিরা একজন আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা থাকার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। নানক আরো অগ্রসর হয়ে গুরুবাদকে ধর্মের কেন্দ্রে স্থাপন করেন। নানকের মতে, গুরুকে শ্রদ্ধা করতে হবে, কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে না। গুরুর পরামর্শ মানতে হবে শিক্ষক হিসাবে; তাকে উপাসনা করা যাবে না। তার লেখাগুলোতেও নিজেকে সবসময় ‘ঈশ্বরের বান্দা’ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।

এত ভ্রমণ আর ঘরহীন জীবনের পরেও নানক সন্ন্যাসবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি জনগণের সাথে বসবাসের পক্ষপাতী। তার মতে, সংসারধর্ম আধ্যাত্মিকতা অর্জনের পথে বাধা নয়। মানুষকে আত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক বিশুদ্ধতাও অর্জন করতে হবে। তার মতে,

“সাকোন ওরে সবকো
ওপার সেক আকার,
অর্থাৎ,
সবার উপরে সত্য, আর সত্যের উপরে সৎ ব্যবহার।”

ইতিপূর্বে বর্ণহীন সমাজ ব্যবস্থার কেবল তাত্ত্বিক প্রস্তুতি চলছিল। গুরু নানক তার বাস্তবিক প্রয়োগ দেখান। শিখ মতবাদ প্রচারের প্রতিটি কেন্দ্রে গুরু কা লঙ্গর বা বিনামূল্যে গণখাবারের ঘর চালু করে বর্ণপ্রথার খাঁচা ভাঙার জোর পদক্ষেপ নেন। অনুসারীদের উপদেশ দেন, সকাল প্রকার বর্ণ ও জাতির উর্ধ্বে উঠে একসাথে খাবার খেতে। সেই ষোড়শ শতকের ভারতে নারী-পুরুষ, জাত-ধর্ম, সাদা-কালো ভেদাভেদহীনতার কথা বলা কম আশ্চর্যের বিষয় নয়।

সাধারণত হিন্দুধর্মে মুক্তির জন্য তিনটি বিকল্প পথ সমর্থন করে-কাজ (কর্মমার্গ), জ্ঞান (জ্ঞানমার্গ) এবং ভক্তি (ভক্তিমার্গ)। নানক আরেক ধাপ এগিয়ে নামমার্গ বা ঈশ্বরের নাম জপকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তার মতে,

“হাত বা পা যেমন কাদায় বিবর্ণ হলে পানি দিয়ে ধুতে হয়,
পোশাক নোংরা হলে যেমন সাবান লাগাতে হয়,
আত্মা পাপে কলুষিত হলে তেমন নামজপ সেটিকে ত্রুটিমুক্ত করে।”

অবশেষ

নানকের পথ ছিল সহজ। নানকের সত্ত্বা ছিল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার।তিনি একাই সবগুলো মতকে একটি পদ্ধতির ভেতরে এনে উদারপন্থা জারি করেন; যা অতি সাধারণ গ্রাম্য লোকটিও বুঝতে পারে, যা উদাসী পথ বলে খ্যাত। তার নির্দেশনা সংক্ষিপ্ত- কীর্তন করো, নাম জপ করো, কাজ করো, উপাসনা করো এবং দান করো। এ কারণেই ওই সময়ের অন্যান্য সাধুরা ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গেলেও দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নানক আর তার ‘ইক ওয়াঙ্কার’ বা ‘সৃষ্টিকর্তা এক’ মন্ত্র।

নানকের ধর্ম রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তিনিই পাঞ্জাবের ইতিহাসের প্রথম জনপ্রিয় নেতা। তার আসল শিষ্যের সংখ্যা হয়তো খুব বেশি ছিল না। কিন্তু যারা অন্য সম্প্রদায়ের হয়েও ‘কোনো হিন্দু নেই, কোনো মুসলিম নেই’ আদর্শে শ্রদ্ধাশীল হয়েছিল; তাদের সংখ্যা যথেষ্ট। এ আদর্শই পরবর্তী সময়ে পাঞ্জাবি জাতীয়তাবোধের জন্ম দেয়। বর্তমান ভারতেই শিখধর্মের অনুসারীর সংখ্যায় ২ কোটির বেশি। ২০০১ সালের হিসাব মতে, যুক্তরাজ্যে সাড়ে তিন লাখ এবং কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে তিন লাখের মতো এই মতাবলম্বী। অন্যান্য দেশেও তাদের অবস্থান বেশ পোক্ত। ৫০০ বছর আগে গুরু নানক যে বীজ বপন করে গেছেন; তা এখন অব্দি সাম্যের বার্তা ছড়িয়ে চলছে বিশ্বব্যাপী।

গুরু নানক জয়ন্তী পালনের দিনটি প্রতি বছর পরিবর্তিত হয় হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে কার্তিক পূর্ণিমায় অর্থাৎ কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। সাধারণ ভাবে এই তারিখটি পড়ে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। তিনদিন ব্যাপী এই উৎসব শিখদের পবিত্র গ্রন্থ গুরু গ্রন্থসাহিব পাঠের মাধ্যমে সূচনা হয়। এই গ্রন্থসাহিব কোনোরকম বিরাম না দিয়ে পাঠ করা হয় একটানা ৪৮ ঘন্টা ধরে, একে অখন্ড পাঠ বলে। গুরু নানক জয়ন্তীর আগের দিনে এই পাঠ সমাপ্ত করা হয়। তারপর সকালে মিছিলের আয়োজন করা হয় যাকে প্রভাত ফেরি বলা হয়। এই প্রভাত ফেরি গুরুদুয়ারা থেকে শুরু হয় আর বিভিন্ন লোকালয়ের দিকে এগিয়ে যায়। মিছিলের আগে আগে পাঁচ জন সশস্ত্র রক্ষী নিশান সাহিব পতাকা বহন করে নিয়ে যায়। মিছিলের সাথে সাথে পবিত্র গুরু গ্রন্থ সাহিবকে ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করে একটি পালকিতে বহন করে নিয়ে চলে। মিছিলে অংশ গ্রহনকারীরা ধর্মীয় গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে। ভোর ৪টা বা ৫টা থেকে আশা-দি-ভর গান গেয়ে গুরু নানক জয়ন্তী শুরু হয় এবং দুপুর পর্যন্ত চলে। দুপুরে গুরুদুয়ারায় উপস্থিত লোকজনদের লঙ্গরখানায় বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়। প্রচুর শিখ ধর্মালম্বী সেবা ও ভক্তি প্রদর্শনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে থাকেন।দিন শুরু করেন তারা সুখমনি সাহিবের এই প্রার্থনা দিয়ে:

দুখভঞ্জন তেরা নামুজি,
দুখভঞ্জন তেরা নাম।
আঠপহর আরাধিয়ে
পূরণ সদ্গুরু নামু।
জিতু ঘটি বসি পার ব্রহ্ম
সোহি সুহাবা থাউ,
জম কঙ্করু নেরি না আবেই
রসনা হরি গুণ গাও।

সেবা সুরতি না জানিয়া
না জাগেই আরাধি,
ওটি তেরি জগ জীবনা মেরে
ঠাকুর আগম আগাধী।
ভয়ে কৃপাল গুসাইয়া, নঠে সোগ সন্তাপ
তাতি বাউ না লাগাই, সদ্গুরু রাখে আপি।
গুরু নারায়ণ দায়ো গুরু
গুরু সচা সিরজন হারু
গুরি তুঠে সব কুচ পাইয়া
জন নানক সতবলিহারু।

গুরুনানক অনুধ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ

****

গুরু নানক ১৪৬৯)–১৫৩৮ভারতবর্ষের চিহ্নিত ধর্মগুরু। তাঁর জীবৎকালে ভারতব (র্ষে চলছে প্রথমে পাঠান ও পরে মোগল রাজত্ব। সেদিন উত্তরভারতকে ধর্মান্তরীকরণের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনিই। তিনি ধর্মে হিন্দু হলেও ভিন্ন ধর্মের প্রতি ছিলেন প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উনিশ শতকে। তখন এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাত প্রবৃত্তি। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে আগত নানকপন্থী সাধুদের সঙ্গ তিনি করেছেন পরম উৎসাহে। কালীবাড়ির কাছে অবস্থিত বারুদখানায় কর্মরত শিখ সেপাইদের সঙ্গেও তাঁর ছিল অবাধ মেলামেশা। তাঁদের কাছ থেকে তিনি গুরু নানকের নানা কাহিনি ও উপদেশ শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে নানক প্রতিষ্ঠিত শিখ ধর্মাদর্শের প্রতি তিনি আগ্রহান্বিত হন এবং শিখধর্মে দীক্ষাও গ্রহণ করেন।

গুরু নানকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাচরণের বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। গুরু নানকের জীবনী থেকে জানা যায়, শৈশবে অধিকাংশ সময়ই ধর্মপ্রাণ নানক গ্রামসংলগ্ন বনে আপনমনে একা একা ঘুরে বেড়াতেন। বনে বহু সাধু তপস্যা করতেন। নানক সুযোগ পেলেই তাঁদের কাছে গিয়ে বসতেন, তাঁদের সেবা করতেন এবং ধর্মোপদেশ শুনতেন। এইভাবে শৈশবেই তিনি প্রচলিত ভারতীয় ধর্মমতগুলির মোটামুটি পরিচয় লাভ করেন। ক্রমে তিনি ধীরে ধীরে ধ্যানের রহস্য জানতে পারলেন। এবং প্রায়ই নির্জনে বসে পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এমন ঘটনা দেখা যায় :"লাহাবাবুদের বাড়ীতে সাধু সন্ন্যাসিগণের-সর্ব্বদা যাত:য়াত ছিল।...বালক গদাধর এই সব সাধুর সঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন এবং তাঁহারা যখন পুস্তক, পুঁথি বা পুরাণাদি পাঠ করিতেন, তখন তিনি নিবিষ্ট মনে ঐ সকল শ্রবণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন গ্রামে কোথাও পুরাণ--ভাগবতসম্বন্ধীয় কথকতা, পাঠ বা গান হইলে সে স্থানে প্রায়ই ঠাকুর হাজির থাকিতেন এবং নিবিষ্ট মনে কথা শ্রবণ করিতেন;...এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুস্তকের ভিতরকার মোটামুটি আখ্যানভাগ

বাল্যকালেই তিনি জানিয়া লইয়াছিলেন।...ঠাকুর গদাধর এইরূপে সাধুসঙ্গের ফলে অতি অল্পবয়স হইতেই ধ্যান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।"

ব্রাহ্মণের বর্ণচিহ্ন উপবীত ধারণ করেননি নানক। উপনয়নকালে তিনি বলেছিলেন, "দয়ার তুলো দিয়ে, সন্তোষের কেটে, সংযমের গিঁট দিয়ে আর সত্যের পাক দিয়ে যে উপবীত হবে–অন্তরাত্মার পক্ষে সেই হবে সত্যকার উপবীত।" শ্রীরামকৃষ্ণও সাধনকালে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। শৈশবে উপবীত ধারণ করলেও তার চেয়ে সত্যপালনকেই শ্রেষ্ঠ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। বালক গদাধর শূদ্রবংশীয় ধনি কামারনিকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাঁর অভিভাবককুল সেই প্রস্তাব বাতিল করার পরিকল্পনা করলে,

"হেথায় গদাই কন ধনী কামারিনী।
ভিক্ষা যদি দেয় তবে ভিক্ষা লব আমি॥
কখন না লব ভিক্ষা অপরের হাতে।।
হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে ॥"

অবশেষে গদাইয়ের জেদের কাছে বড়রা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন। যৌবনে সাধনকালে গুরু নানক গভীর ধ্যানস্থ থাকতেন। ঈশ্বরের বিরহে তাঁর চোখে ঝরত অশ্রুধারা। তাঁর এই আচরণের জন্য অভিভাবকগণ বৈদ্যের মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা করান। কিন্তু সে বিরহের লাঘব ঘটেনি। উন্মাদ' বিশেষণও তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। পরিশেষে নানক ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়েছিলেন :"নানক, আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে আছি, তুমি আমার আশীর্বাদ লাভ করেছ। ভালবেসে যে তোমাকে স্মরণ করবে, সেও আমার আশিস লাভের অধিকারী হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও অনুরূপ ব্যাপার দেখতে পাই। গভীর ধ্যানে তিনি প্রায়শই নিমগ্ন হতেন। সাধনকালে ঈশ্বর বিরহজনিত অস্বাভাবিকতার জন্য তাঁকেও চিকিৎসকের কাছ (গঙ্গাপ্রসাদ সেন) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁকেও সাধারণ মানুষ 'পাগল' ভাবত। দীর্ঘকাল সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার দর্শন লাভ করেন। তাঁর বহু দিব্য দর্শনের কথা জানা যায় যেগুলি থেকে প্রতীত হয় যে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর দেহে অবস্থান করতেন। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, "সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতে ঠাকুর দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট শরীরমধ্যগতযুবক সন্ন্যাসীর দর্শন পাই...ছিলেন এবং ক্রমে সকল কার্যের মীমাংসাস্থলে তাঁহার পরামর্শমত চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। গুরু নানক জাতিভেদ মানতেন না। ধর্মপ্রচারকালে তিনি তাঁর ভক্ত অস্পৃশ্য লালোর গৃহে আতিথ্য নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও রসিক মেথর প্রমুখ বহু অস্পৃশ্য ভক্তকে কৃপা করার কথা জানা যায়। সেখ সজ্জন নামে এক কুখ্যাত দস্যু নানকের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং লুণ্ঠিত অর্থ দরিদ্রদের বিলিয়ে দিয়ে তাঁর শিষ্য হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে এসে কুখ্যাত দস্যু- তারা কাঁড়ারও দস্যুবৃত্তি ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে মিশেছিল। নর্তকী নূরশাহ যেমন নানকের ব্রতভঙ্গে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তেমনি সুন্দরী লছমীবাইও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে ব্যর্থ হন। শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা লাভ করে নতুন জীবন শুরু করেন তিনি। পরবর্তী কালে তিনি জনৈক বৈষ্ণবগুরু কর্তৃক রাধারানি দেবী নামে পরিচিত হন এবং হরিনাম সংকীর্তনে জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করেন।

গুরু নানক শিখধর্মের প্রবর্তক। তাঁর অনুগামী সন্ন্যাসীরা নানকপন্থী সাধু নামে খ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণের আমলে দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্তরা আসতেন এবং তারা কিছুদিন সেখানে অবস্থানও করতেন। কথামৃতের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কমপক্ষে চারবার ১৮৬৮), ১৮৮২, ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ সালে (শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নানকপন্থী সাধুদের যোগাযোগ ঘটেছে। ১৮৬৮ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ রানি রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী গিয়ে এক নানকপন্থী সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। বয়স আঠাশ ঊনত্রিশ। বেদান্তবাদী কিন্তু- ভক্তিমার্গও মানেন। দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল হৃদ্যতার সম্পর্ক। সাধুটি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলতেন'প্রেমী সাধু। একদিন তাঁদের মঠে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যান। নানকপন্থী সাধু গীতা পাঠ করেছিলেন। তা এমনই আঁট যে বিষয়ী মানুষের দিকে তাকিয়ে পড়বেন না। মথুরবাবুর দিকে পিছন ফিরে পড়তে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে মুখ করে বসলেন। পাঠ সমাপ্ত করে সাধু বললেন, "জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পর্বতমস্তকে। সবং বিষ্ণুময়ং জগৎ। শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ।" কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সংসারীদের পরিত্রাণের উপায়। উত্তরে নানকপন্থী সাধু বলেছিলেন, "কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।" কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের খুব পছন্দ হয়েছিল।

কথামৃতে ১৮৮২ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে তিনবার নানকপন্থী সাধুদের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রসঙ্গ আছে। তাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ শিখ ধর্মাদর্শের বহু প্রসঙ্গ শোনার অবকাশ পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন স্বামী প্রভানন্দ :"দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন সময়ে আসতেন অনেক নানকপন্থী সাধু। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের অভ্যর্থনা করতেন, নমো নারায়ণায়' বলে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাদর ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন, শিখধর্ম সম্বন্ধে বলতেন। তাঁদের কাছে শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণ শিখদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন :'শিখরা শিক্ষা দেয় 'তু সচ্চিদানন্দ। শিখদের মতে অশ্বত্থাগাছের যে পাতা নড়ছে তাও ঈশ্বরের ইচ্ছায়–তার ইচ্ছা বই একটি পাতারও নড়বার জো নাই।' তিনি আরও বলতেন :'শিখরা বলে, জমি, জরু আর টাকা–এতিনটির জন্যই যত গ-োলমাল। ভক্ত শিখ সেপাইরা শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনাত গুরু নানকের সুন্দর সুন্দর কাহিনী। সেইসব কাহিনী শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সব ব্যাখ্যা করতেন সেপাইদের তা-মনে ধরত। ঠাকুরের সেসব কথা তাঁদের হৃদ-য় স্পর্শ করত। গুরু নানকের একটি কাহিনী তিনি প্রায়ই বলতেন। তিনি বলতেন:

নানকের গল্পে আছে–অসাধুর দ্রব্য ভোজন করতে গিয়ে দেখলুম সেসব রক্তমাখা হ-য়ে রয়েছে।
সাধুদের শুদ্ধ জিনিস দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিস দিতে নেই। সত্যপথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মিষ্ট কথাবার্তা শুনে তাঁর উপর তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। তারা শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু নানকের অবতার বলে মনে করতে থাকে। বস্তুত নানকপন্থী সাধুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ শিখদের দশগুরু সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকার এতথ্য দি-য়েছেন :"শিখদের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "উঁহারা সকলে জনক ঋষির অবতার–শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনার উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্মসংস্থাপনপূর্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন; শিখদিগের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থে দমদম, চানক ও দক্ষিণেশ্বরের শিখ সেপাইদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায়। শশিভূষণ সামন্তের এক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় যে সেকালে বহু শিখভক্তের আগমন হত দক্ষিণেশ্বরে। চানক, দমদম ও কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চল থেকেও পাঞ্জাবি পুরুষ ও মহিলারা কালীবাড়িতে এসে পরমহংসদেবকে দর্শন ও প্রণাম জানিয়ে তাঁর উপদেশ শুনতেন। শশিভূষণ ঘোষ জানিয়েছেন :"বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইবার সময় তিনি নানকপন্থী শিখ সম্প্রদায়েরও বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কালীবাড়ির পার্শ্বেই গভর্ণমেন্টের বারুদখানা। একদল শিখ সৈন্য রক্ষীরূপে তথায় অবস্থান করিতেছিল। ইহারা সকলেই নানকপন্থী; কালীবাড়িতে মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার সহিত ধর্মালাপ করিত। তিনিও বারুদখানায় নিমন্ত্রিত হইয়া যাইলে তাহারা তাঁহাকে আপনাদের পরিশুদ্ধ শয্যায় বসাইয়া নিজেরা ভূতলে বসিত এবং স্বহস্তে তামাক সাজিয়া তাঁহার সেবা করিত। তাহাদের হাবিলদার কোয়ার সিং তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। কোয়ার সিং একদিন বলিয়াছিলেন,–"সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দেখি নাই–তুমি নানক!'

তিনি বলিতেন, 'কালীঘরের সামনে শিখরা বলেছিল,–ঈশ্বর দয়াময়। আমি বল্লাম, দয়া কাদের উপর? শিখরা বল্লে–কেন মহারাজআমাদের সকলেরই উপর। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন !, আমাদের জন্য এতো জিনিস তৈয়ারী করেছেন, আমাদের মানুষ করেছেন, আমাদের পদে পদে বিপদ থেকে রক্ষা কচ্চেন। আমি বল্লাম তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখছেন,–তা এতে কি বাহাদুরী? আমরা সকলে তাঁর ছেলে, ছেলের উপর আবার দয়া কি? তিনি ছেলেদের দেখছেন–তা তিনি দেখবেন না তো বামুন পাড়ার লোক এসে দেখবে? তবে কি তাঁকে দয়াময় বলবে না? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা ততক্ষণ তাঁকে সবই বলতে হয়। তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়, আমরা খুব দূরের লোক–পরের ছেলে। "একসময় কোয়ার সিং–তখন তাহার সৈন্যদল বারাকপুরে থাকিত–তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তিনি বলিয়াছিলেন, কি অবস্থাই গেছেকো !য়ার সিং সাধু ভোজন করাবে, আমায় নিমন্ত্রণ কল্লে। গিয়ে দেখল্লাম, অনেক সাধু এসেছে। আমি বসলে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লে। যাই জিজ্ঞাসা করা আমি আলাদা বসতে গেলাম। ভাবলাম অত খবরে কাজ কিতারপর যেই সককে পাতা পেতে খেতে বসালে !, কেউ কিছু না বল্‌তে বলতে আমি আগে খেতে লাগলাম। সাধুরা কেউ কেউ বল্‌তে লাগলো শুনতে পেলাম–আরে, এ কেয়ারে চানকের পল্টনের ভিতর ইংরেজকে আসতে দেখে সেপাইরা সেলাম কল্লে। !কোয়ার সিং আমায় বুঝিয়ে দিলে, ইংরেজের রাজত্ব তাই ইংরেজকে সেলাম কর্তে হয়।

"এই সৈন্যদল কলিকাতার কেল্লায় একদিন বদলি হইয়া যাইতেছিল। মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে গাড়িতে লইয়া মাঠে বেড়াইতে যাইবার পথে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায়। সৈনিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও সৈন্যদল 'শ্রীগুরুর জয়উচ্চৈঃস্বরে ঘ !োষণা করিয়া একে একে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-'তে এঘটনার উল্লেখ আছে-, শিখ সৈন্যরা সেনাপতির বিনা অনুমতিতে বন্দুক রেখে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রণিপাত করলে পরে তিনি সৈন্যদের সামরিক রীতি ভঙ্গের জন্য কৈফিয়ত তলব করেন। উত্তরে শিখ সৈন্যগণ বলে,

"আমাদের এই রীতি গুরুদরশনে৷৷-
নাহি করি কোন গ্রাহ্য থাক্ যা প্রাণ।
দেখিলে করিব আগে গুরুরে প্রণাম ॥

গুরুদাস বর্মন তাঁর গ্রন্থে আরও দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। প্রথম ঘটনাটি দক্ষিণেশ্বরে সেপাইদের ব্যারাকে। মাঝে মাঝেই শিখ সেপাইরা তাঁকে নিয়ে যেতেন বারুদখানায়। সে-যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন নারায়ণ শাস্ত্রী। রাজস্থানের জয়পুরের মানুষ তিনি। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে সেপাইরা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। তাঁর জন্য বিশেষ আসন এনে তাঁকে বসায় এবং তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়। উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে শাস্ত্রকথা শ্রবণ। তারা তন্ময় হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনছে, এমন সময় নারায়ণ শাস্ত্রী ঠাকুরের কথায় কিছু শাস্ত্রীয় প্রমাণবাচক কথা বলতে চাইছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মাঝে তিনি কথা বলায় শিখরা বিরক্ত হয়। তাতেও নারায়ণ শাস্ত্রী যখন সংযত হলেন না, তখন শিখ সেপাইরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে, "ও কেয়া গৃহী হোকে জ্ঞান বতাতা!" কৃপাণ হাতে ছুটে আসে তারা। এঘটনা-য় শঙ্কিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গুণমুগ্ধ শিখ সেপাইদের শান্ত করেন। দ্বিতীয় ঘটনার স্থান ব্যারাকপুর। অন্য দিনের ঘটনা। শিখ সেপাইরা তাঁকে ব্যারাকপুরে নিয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে তারা প্রশ্ন করেসংসারে কীভাবে থাকতে হ :য়? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "(ছুতারেরমে (য়েরা যেমন ভেঁকির গর্তে হাত দিয়ে চিঁড়ে পালটে দেয়, অথচ সেই সঙ্গে ছেলেকে মাই দেয়, আবার হয়তো একটি খদ্দেরের সঙ্গে দর হিসেব করে, এতগুলো কাজ একসঙ্গে করে, কিন্তু মনটা তার থাকে সেই ঢেকির দিকে; তাই ঢেকিটা হাতের উপর পড়ে না। সেইরকম সংসারে থেকে ষোলআনা মনটি ভগবানে দিয়ে রাখতে হয়; তাহলে আর কোনও গোল থাকে না।"

আর একটি ঘটনা উপস্থিত করা যায় স্বামী প্রভানন্দজীর বিবরণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছেন ব্যারাকপুরে তার : বন্ধু রাম মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ শিখ সেপাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।"স্নানের সময় হলো। সেপাইরা দল বেঁধে ঠাকুরকে নিয়ে চলে গঙ্গার দিকে, ঠাকুরের সাথে একসঙ্গে স্নান করবে সবাই। সম্ভবত রাসমণি ঘাটেই ঠাকুর স্নান করেছিলেন। স্নানের ঘাটে এসে সেপাইদের মধ্যে কেউ ধরে ঠাকুরের চটিজুতো, কেউ ধরে ছাতা, কেউ ধরে কাপড়। স্নানের ঘাটে ঠাকুরকে নিয়ে তাদের আনন্দের সীমা নেই। হৃদয় ঠাকুরকে তেল মাখিয়ে দেন। ঠাকুর গঙ্গায় স্নান করেন। সেপাইরা ঠাকুরের জন্য কিনে আনে একটাকা একআনার জিলিপি। সাধ্যমত দেবতাকে তাদের ভোগ নিবেদন। স্নান সেরে ঠাকুর সেই জিলিপি থেকে নিজে একটু গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে বাকিটা সৈন্যরা ভাগ করে প্রসাদ গ্রহণ করে।"

প্রধান আটটি বিষয়ে গুরু নানক ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সাদৃশ্য দেখা যায়। ঈশ্বরের রূপ নানক :বলেছেন, "আদি সচ যুগাদি সচ। হ্যায় ভি সচ, নানক হোসি ভি সচ।" সত্যস্বরূপ ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে সত্য ছিলেন, যুগের আদিতেও সত্য ছিলেন, বর্তমানেও সত্য রূপে বিরাজিত এবং ভবিষ্যতেও বিরাজ করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠেও একই অভিব্যক্তি :"...সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য–তিনকালেই আছেন–আদি অন্তরহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হদ্দ বলা যায়, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।"

এই বিষয়ে নানক পুনরায় বলেন, "কেতিয়া দূখ ভূখ যদমার। এই ভি দাতে তেরি দাতার॥ বন্দ খলাসী ভানে হা◌েয়। হা◌ের আখ না সকে কোয়॥"–পরমেশ্বর ইচ্ছাময়, লীলাচঞ্চল। তিনি একাধারে দাতা এবং হরণকর্তা। তাঁর ইচ্ছায় যেমন ভক্ত লাভ করে পরম ইষ্টকে, তেমনই তাঁর ইচ্ছায় জীবন হয় ঈশ্বরবিমুখ; তিনি যেমন সকল জীবের পালনকর্তা, তেমনই আবার তাঁরই ইচ্ছায় কত জীব ক্ষুধায় কাতর ও মৃতপ্রায়।

শ্রীরামকৃষ্ণও একই সুরে বলেছেন, “ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।” ঈশ্বরই “ভাল লোক করেছেন, মন্দ লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন–বিশ্বাসী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন।” তাঁর কৃপা হলেই “অমনি দর্শন আর জ্ঞানলাভ।”

সত্যনানক বলেছেন :, “যে জন যাচে যিন সচ পছানেয়া। আপ মার সহজ নাম সমানেয়া॥” যাঁরা সৎকে জেনেছেন, তাদের জীবনই সত্য; কারণ তারা স্বীয় অহংসত্তাকে বিনষ্ট করে সত্যনামের মধ্যে নিজেদের লীন করে দিতে সমর্থ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রত্যয়কেই ঘুরিয়ে বলেছেন, “মনের লয় হওয়া চাই, আবার অহংতত্ত্বের... লয় হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।”

নানক আরও বলেন, “সচ সিমরিয়ে হোরে পরগাশ। তাতে বিখিয়া মহে রহে উদাস।”–সেই সত্যস্বরূপকে স্মরণ করলে মনের সকল তমসা ভেদ করে আলোকের আবির্ভাব হয় এবং বিষয়সম্পদের প্রতি ঔদাসীন্য আসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “কলিযুগে ভক্তিযোগই ভাল। ভক্তি দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়। দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই সকল বিষয়। ...বিষয়বুদ্ধি থাকতে ‘সোঽহম হয় না।”

নামমহিমানানক বলেন :, “নানক ভগতা সদা বিগাস। সুনিয়্যা দুখবাপ কা নাশ-॥”–যাঁরা ভক্ত তাঁরা নিয়ত প্রভুর নামরূপ। আনন্দসাগরে ডুবে থেকে স্বীয় অন্তরাত্মাকে বিকশিত করে তোলেন। নামশ্রবণে দুঃখ ও পাপের বিনাশ হয়ে অন্তরাত্মা শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, “যিনি পাপ হরণ করেন। তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।” “হরিভক্তি হইলে আর জাতি বিচার থাকে না।”

নানক বলেছেন, “যিন্নি নাম ধেয়ায়া গয়ে মুসক্কত ঘাল।। নানক তে মুখ উজলে কেতি ছুটি নাল।”–যাঁরা বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রভুর সত্যনাম বিস্মৃত হন না, অন্তিমে তাঁদের মুখোজ্জ্বল হয় এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে আরও বহু জীব সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “যোগমায়ার আকর্ষণ ভেলকি লাগিয়ে দেয়।...হরিলীলা সব যোগমায়ার সাহায্যে ...! গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকী ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। ঈশ্বরলাভ হলে সব পাশ চলে যায়।” “জীবে দয়া, ভক্তসেবা আর নামসংকীর্তন”- সংসারীদের মুক্তিলাভের পথ, বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

গুরুনানক বলেছেন :, “সো গুরু করও জে সাচ দৃঢ়াবে॥ অকথ কথাবে, শব্দ মিলাবে॥”–গুরুপদে বরণ করবে তাঁকেই যিনি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করতে পারেন, যিনি ঈশ্বরের রূপকে সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করতে এবং তাঁর নাম তোমার হৃদয়ে প্রোথিত করে দিতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ‘গুরু’ প্রসঙ্গে বলেন, “যেসে ল-োক গুরু হতে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তুও চড়ে যেতে পারে।তাই ঈশ্বর যুগে যুগে ল...োকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন।”

নানক আরও বলতেন, “সতগুরু মিলেয়া সচ পায়া। জিনহী বচহ আপ গবায়া॥”–সদ্গুরু প্রাপ্তি হলেই সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রাপ্তি হয়॥

শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠেও একই প্রত্যয় :“সৎগুরুর কাছে উপদেশ লতে হয়।” “গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়।”

পাপনানক বলেছেন :পুণ্য-, “কাম ক্রোধ দোই-করো বসোলে গোডহো ধরতী ভাই। জিও গোডহো তিও তুম সুখ পাবহো কিরৎ না মেটেয়া যাই।” “হে মানব, তুমি কাম আর ক্রোধরূপ শক্তিকে নিড়ানিতে পরিণত করো এবং তার সাহায্যে তুমি তোমার দেহরূপ জমির বিকাররূপী আগাছাগুলিকে ধ্বংস করে জমিকে উর্বরা করে তোলো।

শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠে অনুরূপ স্বর :“অভ্যাসযোগের দ্বারা কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যা-য়।...অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে, তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতেকাম-, ক্রোধ বশ করতে কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাতপা টেনে নিলে আর বাহির করে না-; কুড়ুল দিয়ে চারখানা করে কাটলেও আর বাহির করে না।”

নানক বলেন, “ভাও ভগতি কর নীচ সদায়ে। তাও নানক মোখস্তর পায়ে॥”–যিনি ঈশ্বরের দাসত্ব ও সেবা করে দীন রূপে পরিচিত হন (অহংরহিত), নানকের মতে তিনি অন্তিমে মোক্ষ লাভ করে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, “হাজার বিচার কর, ‘অহং’ ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত। একান্ত যদি ...‘আমি’ যাবে না, থাক শালা ‘দাস আমি’ হয়ে। “হে ঈশ্বরতুমি প্রভু !, আমি দাস’ এইভাবে থাক।”

সৃষ্টি, সংসার ও মানুষনানকের কথা :য় :“জ্যায় সে জল মহে কমল। নিরালঘু মুরগাঈ ন্যায় সানে। সূরত শব্দ সাগর তরিয়ে নানক নাম বখানে॥” সীমাহীন সরোবরে কমল যেমন অবলীলাক্রমে ভেসে থাকে, পানকৌড়ি যেমন জলের গভীরে ডুব দিয়েও জলস্পর্শ হতে মুক্ত থাকে, তেমনই নামকে আশ্রয় করলে জীব মায়া ও মোহের আকর্ষণ অবলীলাক্রমে জয় করে ভবসাগর লঙ্ঘন করতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ,” “এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো–পিপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।আর পানকৌটির মত...ো। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।”

সেবা, ভক্তি ও নম্রতাগুরু নানক বলেন :, “বিচ দুনিয়া সেব কমাইয়ে॥ তা দরগাহ ব্যয়ঠন পাইয়ে॥”–এই সংসারে জীবের সেবা করে পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তিনি তুষ্ট হলেই তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করার অধিকার অর্জন করা যায়॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “জীবকে খাওয়ানো সাধুর কাজ; সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।” “সংসারীদের যা কর্তব্য চৈতন্যদেব বলেছিলেন, জীবে দয়া, বৈষ্ণবসেবা, নামসংকীর্তন।” নানক অন্যত্র বলেছেন, “অপ গবায়ে সেবা করে তা কছু পায়ে মান।”–আত্মসুখ বিস্মৃত হয়ে যিনি জীবের সেবার পথ অবলম্বন করেন, তিনিই প্রভুর দরবারে যথাোচিত সম্মান লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এপ্রসঙ্গে বলেন-, “দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান।” তিনি এটি ত্যাগ করার জন্য ভক্তদের পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিতেন এবং আরও বলতেন, “সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো–তাকে আত্মসমর্পণ করো। তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন।”

গৃহ, বৈরাগ্য ও ত্যাগনানক বলেছেন :, “কেয়া জংগল টুটী যায়ে। মায় ঘর বন হরিয়া বলা। সচ টিকে ঘর আয়ে শব্দ উবলা॥”–ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য আমি বনে যাব কেন? বনে গেলেই যদি তাকে পাওয়া যায় তাহলে আমার গৃহকেই আমি কল্পনা করে নেব সুন্দর সবুজ বনস্থলীরূপে। যার মন সেই সদা স্থির প্রভুর স্মরণে স্থৈর্য লাভ করে, ঈশ্বর তার মনোরূপ গৃহে এসে সতত অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণেরও অনুরূপ অভিমত। বৈরাগ্যের ভান তিনিও পছন্দ করতেন না। বলতেন, “কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না-হলে হয় নাবাহি !রে ত্যাগ আবার ভিতরে ত্যাগ। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না।” তার এ নিদের্শ অবশ্য-সন্ন্যাসীদের জন্য। গৃহীদের উদ্দেশে তিনি বলতেন, “তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থগুলি পাঠে জানা যায় যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে শিখদের সঙ্গ পেয়েছেন, নানকপন্থী সাধুদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, তাঁদের মুখ থেকে গুরু নানকের জীবনের কথা জেনেছেন। ক্রমে তিনি শিখ ধর্মের মূল চিন্তার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করেন এবং এই ধর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হন। ১২৯৭ সালে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাচীনতম জীবনীগ্রন্থের লেখক রামচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন :“তাঁহার প্রাণ (শ্রীরামকৃষ্ণের) যারপরনাই উৎসাহিত হইলে তিনি শিখধর্মে দীক্ষিত হইলেন।” এ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছেন অনুকূলচন্দ্র সামন্ত :তাঁর গ্রন্থে (মণ্ডল)“দ্বারিকাবাবুর পুত্র গুরুদাসবাবুর মুখ হইতে শুনিয়াছিলাম, পরমহংসদেবের বহু শিখ সম্প্রদায়ের ভক্ত ছিল। তাহাদের অনেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নিকটে কর্মসূত্রে অবস্থান করিতেন। তাঁহার পরিচিত কোনও শিখ ভক্তের আগ্রহে তিনি একবার সম্ভবত) ১৮৬৯ সালেবড়বাজারের গুরুদো (য়ারায় হাজির হইয়াছিলেন। সেই কালে শিখদের কোনও মহাত্মার আগমন উপলক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে এই যাত্রা ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের উপাসনাবেদীর নিকট হাজির হইয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, শিখ ধর্মগুরু নানকের সহিত তিনি আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।”

প্রসঙ্গত, বড়বাজারের সেই ঐতিহাসিক গুরুদোয়ারার নাম ‘গুরুদোয়ারা সিখ সংগত। ঠিকানা ১৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণ ঘটেছে। এই গুরুদোয়ারার দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে :“এই পবিত্র স্থানে শ্রীগুরুনানকদেবজী ১৫১০ ইসবীর ২২ জানুয়ারি পদার্পণ করেন। ওই সময় এখানে মহামারীর প্রকোপ চলছিল। এই স্থানে উনি সৎসঙ্গ কায়েম করেন এবং উনি এই স্থানে দৈনিক সৎসঙ্গ করার আদেশ দেন। এই স্থানে বারো দিন থাকার পর জগন্নাথ পুরী উদ্দেশ্যে রওনা হন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরের অসীম কৌতুহল, অপরিসীম নিষ্ঠা, আন্তরিক অভীপ্সায় শিখ ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেই শিখধর্ম সাধনা করেছেন। উনিশ শতকের ছয়ের দশকে অর্থাৎ যখন তিনি সাধনায় মগ্ন, সেই কালে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার মানুষের কাছে তিনি অপরিচিত। তখনও কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। অথচ দক্ষিণেশ্বরের শিখ সেপাইদের মারফত কলকাতার অন্যান্য শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের কাছে তিনি পরিচিত হয়েছেন। এপ্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন-, “পুণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বরের উত্তরপার্শ্বে সরকারী বারুদখানায় মুক্ত তরবারিকরে শিখ প্রহরীগণের ভাগ্যোদয়–লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রভুর বিবিধ সাধন প্রণালী-দর্শনে। ওই শিখ প্রহরীগণের মুখেই প্রভুর প্রথম প্রচার বড়বাজার মাড়োয়ারী মহলে। ক্রমে প্রভুর আকর্ষণে, মধুকরের ন্যায়...সিদ্ধ, সাধু, সাধক ও সুধিগণের আগমন।” কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার তথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে শিখ সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণঅনুরাগীদের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন।-

তথ্যসূত্র তড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা :

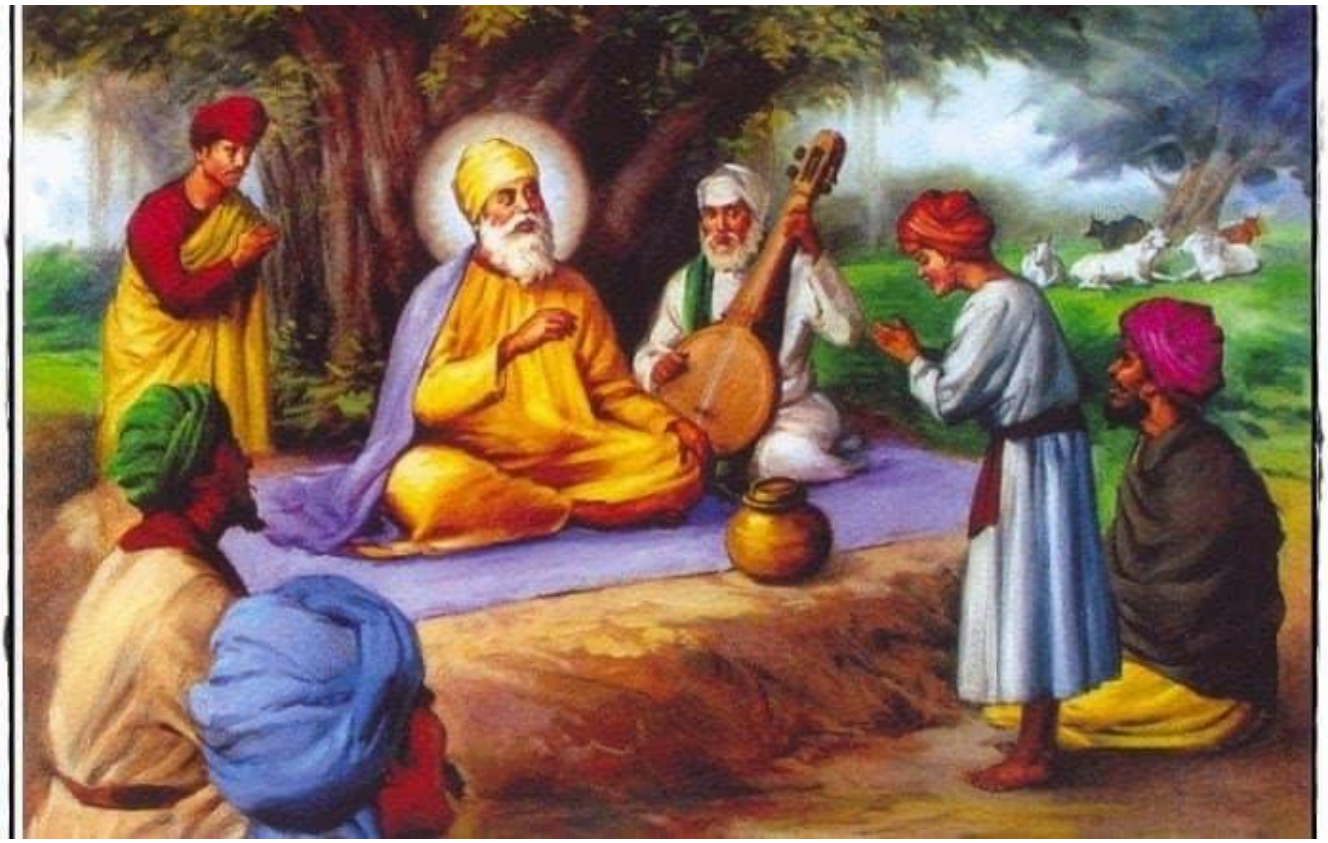

॥মহর্ষি গালব, দ্রৌপদী ও পরশুরাম॥

(রূপক ছেড়ে সারসত্য)

মহর্ষি গালব–এখনকার গোয়ালিয়র শহর ছিল মহর্ষি গালবের তপোস্থলী। ইতিহাস ঘাঁটতে বসে চলে গেছিলাম মহাভারতের কালে। গোয়ালিয়রে বসে তাই একটু সন্ধানে ব্রতী হতেই অনেক তথ্য পাওয়া গেল।
সাবর্ণী মন্বন্তরে মহাযশা ঋষি গালব ছিলেন পুরুবংশীয় নরপতি ব্রহ্মদত্তের সখা। সাতজন ঋষি ছিলেন সেই মন্বন্তরে–রাম, ব্যাস, আত্রেয়, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৌশিক, গালব ও কাশ্যপ। কৌশিক বিশ্বমিত্র ঋষির আরেক নাম। গালবের কথা আমরা পাই মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে।

মাত্র ৯ বছর বয়সে গালব এসেছিলেন সমিৎপানি হয়ে ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে। বালক সমাবর্তনের শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নি। কারণ গুরুগৃহে থাকাকালে তাঁর পিতামাতা গত হন। সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় গুরুগৃহে কাল কেটেছে গালবের। ঋষিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এই শিষ্যকে। সর্ববিদ্যায় পারংগম, সেবা-তৎপর গালবের বিশেষ গুণ। বেদের সমগ্র শাখায় তাঁর অনায়াসে বিচরণ ক্ষমতা। অন্তেবাসী মাত্রেই জানেন গালব অসাধারণ বিচারমল্ল।

কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য এবং অতুলনীয় বিচার ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে অভিযোগ আসে–বিচারকালে গালব বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধদের সম্মান রাখেন না।

প্রিয় শিষ্যের নামে অভিযোগ শুনে জ্বলন্ত পাবকের মত মৃগচর্মে সমাসীন গায়ত্রীর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গুরু বিশ্বামিত্রের মুখাবয়বে দেখা দিল ভ্রূকুটিরেখা। সমগ্র ব্রহ্মবর্তে তাঁর আসন বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। অসংখ্য তাপস, ঋষি বালক, ঋত্বিক, অধ্বর্যু তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। পবিত্র হোম ধূমে চারিদিক সুরভিত। এহেন শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গুরু বলছেন–গালব কবে তুমি তর্ক ও জল্প ছেড়ে মৌন অবলম্বন করবে? কবে তুমি মুনি হবে? “বৃত্তেন হি ভবত্যার্থো ন জ্ঞানম ন বিদ্যয়া।” গালব মনে রেখো পরিশীলিত আর শ্রদ্ধান্বিত জীবনচর্চা দ্বারাই লোকে আর্য হয়। গালবের সতীর্থদের কাছে এ দৃশ্য কল্পনাতীত। বিনীত কণ্ঠে অথচ সপ্রতিভ ভাবে গালব নিবেদন করলেন–“অধুনৈব, অধুনৈব প্রভো!” আপনি আশীর্বাদ করলে এখনই পারি।

সেই থেকে গালব হলেন মৌনব্রতী। কখনো কুরু, কখনো পাঞ্চাল, কখনও বা পুষ্করের গহন অরণ্যে অবধূতের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন গালব। এইভাবে প্রব্রজ্যা করতে করতে একদিন গালব রাজা অশ্বপাণির অন্তঃপুরে দৈবাৎ প্রবেশ করেন। কোন দিকে দৃক্‌পাত নেই, আত্মানন্দে তিনি বিভোর। প্রতিহারীরা সঙ্গে সঙ্গে এই নির্লজ্জ অবধূতকে বন্দী করে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করল।

ক্রুদ্ধ রাজার আদেশে তখনই তাঁর একখানি হাত কেটে ফেলা হল। এতে গালব কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মাটিতে ছিন্ন হস্ত পতিত হল। রক্তের ধারা ঝরে পড়ছে। অথচ আহত ব্যক্তি উদাসীন। মুখে কোন ব্যথা বেদনার বিকার নেই। কোন আর্তনাদ নেই। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে সপারিষদ রাজা স্তম্ভিত। তিনি বুঝলেন যে এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন সিদ্ধ তাপস। তাঁরা সবাই পদতলে পড়ে বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। প্রসন্ন

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অবধূতের মুখ। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন–"অপিধভৎস্ব।" ভীত সন্ত্রস্ত রাজা শশব্যস্তে হাতখানি তুলে নিয়ে যথাস্থানে সংলগ্ন করলেন–ক্ষত চিহ্ন নিমেষে গেল মিলিয়ে–হাতটি যথাপূর্বং তথাস্থিতং। গালব তাঁদেরকে আশীর্বাদ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন সেখান থেকে।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে গালব একদিন গভীর রাত্রিতে এক তপোবনের ব্রীহি যবাদির গোলার কাছে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা ভাবলেন এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই তস্কর। তারা লগুড় হস্তে গালবকে প্রহার করতে উদ্যত হতেই তিনিও তাদেরকে নিবারণ করার জন্য হাত তুললেন। আশ্চর্যের বিষয় ধ্যানস্থ যোগী এবং আশ্রম রক্ষকদেরকে সারারাত্রি ঐ অবস্থাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রত্যুষে গালব চলে যাবার পর ঐ নিশ্চল অবস্থা থেকে আশ্রম রক্ষকরা মুক্তি পায়।

জনপদে জনপদে ছড়িয়ে পড়ছে গালবের অত্যাশ্চর্য কাহিনীর কথা। আপামর জনসাধারণ গালবকে দেখলেই শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে পড়ছে। গালবের কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য নেই। অর্ন্তলক্ষ্য বহিঃদৃষ্টি, সর্বত্র সমদর্শন সদানন্দময় গালব এগিয়ে চলেছেন গুরু দর্শনের তীব্র আকাঙ্খা বুকে নিয়ে। পথে আবার এক বিভ্রাট দেখা দিল। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে বয়ে নিয়ে চলেছে কাঠুরিয়াদের দল। তারা গালবকে চেনে না। দলের সর্দার শক্ত সামর্থ গালবকে জোর করে কাষ্ঠভার বহন করতে বাধ্য করল। মহাপুরুষের কিছুতেই আপত্তি নেই–কোন ক্লেশেই তিনি কাতর নন। কাঠের বিপুল বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন কাঠুরিয়াদের সঙ্গে। দলনেতা মহাখুশী। দুর্বিপাক দেখা দিল একটু পরেই। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কাঠুরিয়াদের স্তূপীকৃত কাঠের রাশির উপর তিনি বোঝাটি ফেলে দেবার পরেই দেখা গেল আশ্চর্য অগ্নিকাণ্ড। সমস্ত কাঠই ভস্মীভূত হয়ে গেল।

ঘটনাটি ঘটল গুরুর আশ্রম থেকে নাতিদূরস্থ অরণ্যের এক উপান্তে। কাজেই সেসব কথা ঋষি বিশ্বামিত্রের কর্ণগোচর হতে বিলম্ব হল না। গালব আশ্রমে পৌঁছে গুরুর চরণে ভূলুণ্ঠিত হলেন। কিন্তু গুরু প্রণাম গ্রহণ করলেন না।.....ঋষি বিশ্বামিত্র বললেন–আমার প্রথম দাবী–পরম বেদবিৎ আচার্য শাকলের সাহচর্য্যে থেকে তুমি বেদমন্ত্রের ক্রমবিভাগ কর। বেদের স্বর ও ছন্দের অনুসরণে মন্ত্র সংহিতা এবং ব্রাহ্মণের একটি ক্রমানুসারিণী রচনা কর ভবিষ্যৎ উত্তরপুরুষদের জন্য। আর রচনা কর এমন একটি ব্যাকরণ যা পূর্ণাঙ্গ দর্শনের মর্যাদা পায়। কেননা পদ ও পদার্থের বোধ ব্যতীত তন্মূলক বৈদিক বাক্যার্থের সম্যক জ্ঞনোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। বেদমন্ত্রের আলোক দীপিকা স্বয়ং মহেশ্বরের রচিত। প্রাচীনতম মাহেশ ব্যাকরণ, ইন্দ্র রচিত ঐন্দ্র ব্যাকরণ, ভাণ্ডারীমুনি রচিত ভাণ্ডরীয় ব্যাকরণ, মহর্ষি কাশকৃৎস্ন রচিত কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণ প্রভৃতি ব্যাকরণগুলি কালের স্থূল হস্তাবলেপে জীর্ণ এবং বিস্মৃত হতে বসেছে। তুমি সেইগুলিতে সমকালীন শব্দ ও পদ সংযোজিত করে তাকে আরও উজ্জ্বল ও পরিমার্জিত করে তোল।

"শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।" শিক্ষাশাস্ত্র যদি বেদের প্রাণ হয়, ব্যাকরণ হল তার মুখ। ব্যাকরণের মধ্যে সমুচ্চ দার্শনিক ভাব এমনভাব উপ্ত করে দাও যাতে তা পাঠ ও মনন করলেই লক্ষ্যবস্তু ব্রহ্ম যেন প্রকটিত হয়ে পড়ে। শাস্ত্র এমন হোক যা মানুষের সকল জিজ্ঞাসার ইতি ঘটিয়ে তাকে পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। গালব গুরুর দুটি ইচ্ছাই পূর্ণ করলেন। একদিকে তিনি যেমন বেদের ক্রমবিভাগ করে তার স্বর ও ছন্দ বিন্যাস করেছিলেন তেমনি অন্যদিকে ব্যাকরণ রচনা করে তাকে উন্নত করেছিলেন দর্শনের পর্যায়ে। তাঁর রচিত ব্যাকরণ গালব ব্যাকরণ নামে বিখ্যাত। দুঃখের বিষয় বর্তমানে গালব ব্যাকরণ দেখতে পাওয়া যায় না।

একসময় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এই ব্যাকরণের পঠন পাঠন হত এবং পরবর্তীকালে পাণিনি রচিত ব্যাকরণের পূর্ববর্তী সময়ে রচিত সেনশীয় ব্যাকরণ,কাশ্যপি ব্যাকরণ, স্ফোটায়ণ ব্যাকরণ, আপিশন ব্যাকরণ, ব্যাড়িয় ব্যাকরণ, শাকল্য ও শাকটায়ণ ব্যাকরণ প্রভৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

স্বদেশে ঐতিহ্যের মহান্ মহিমালয়ে
করি প্রতিষ্ঠিত, ধন্য করি দিলে জন্মভূমি
শাশ্বত স্বাক্ষরে। সারস্বত সাধনার সিদ্ধমন্ত্রে তব
মূক যাহা হল তা বাঙ্ময়।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র আদতে ছিলেন ক্ষত্রিয় তেজ সম্পন্ন। গাধিরাজের পুত্র কৌশিক ওরফে বিশ্বামিত্রের ধনরত্নের অভাব ছিল না। তাই পার্থিব ধনসম্পদের প্রতি আসক্তিও ছিল না। এদিকে গালবের অধ্যয়ন সম্পন্ন হবার পর, দীক্ষা নিয়ে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার জন্য গুরুর অনুমতি নেবার সময় উপস্থিত হল। গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা আর অবিচল ভক্তিতে আপ্লুত গালব স্থির করল, যে গুরুদক্ষিণা না দিয়ে সে কোনভাবেই আশ্রম ত্যাগ করবে না। নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সে কিছু না কিছু দক্ষিণা সে দেবেই বলে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। বিশ্বামিত্র গালবের মনের এই কথা আগেই জানতে পেরেছিলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পার্থিব কোনকিছুর প্রতি আসক্তি ছিল না বলেই তিনি কোনরূপ গুরুদক্ষিণা নেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি দরিদ্র এই ব্রাহ্মণপুত্রের কাছ থেকেও কোন গুরুদক্ষিণা নিতে অস্বীকৃত হন। তিনি গালবের সব অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করেন। তাকে তিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করেন।

তথাপি গালব গুরুদক্ষিণা দেবার গোঁ ধরে থাকায় বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। গুরুর নিষেধ সত্বেও গালবের এই গুরুদক্ষিণা দেবার প্রচেষ্টাকে তাঁর স্পর্ধা বলেই মনে হয়। তিনি তথাপি নিজেকে শান্ত রেখে গালবকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, গুরুদক্ষিণা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গালব করজোড়ে অনুনয় করে বলে, ‘হে গুরুদেব, গুরুদক্ষিণা না দিলে, আপনার কাছ থেকে অর্জিত বিদ্যা আমার জীবনে ফলপ্রসু হবে না। আমায় আপনি কৃপা করে আদেশ করুন।’

বিশ্বামিত্রের, শিষ্যকে বোঝানোর যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হওয়াতে তার ক্ষত্রিয় তেজ ক্রমশ জাগ্রত হয়ে ওঠে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে সামান্য এক ব্রাহ্মণপুত্র কি দক্ষিণা দেবে! যেখানে তিনি তার সমস্ত ধনসম্পদের প্রতি মায়ামোহ ত্যাগ করে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, ইন্দ্রিয়জয় করেছেন!! গালবের দৃঢ়তা তার সমস্ত ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে তাকে ক্রমশ উত্তপ্ত করে তুলল। তিনি মনে মনে রুষ্ঠ হলেও গালবকে তো অভিশাপ দিতে পারেন না। কারণ রীতি অনুযায়ী গুরুদক্ষিণা দেবার কথা বলে সে কোন অন্যায় করেনি। বরং এতে তার গুরুভক্তিরই প্রমাণ মেলে।

কিন্তু তিনি নিজের অতীত কি করে ভুলে জান? তিনি মনে মনে গালবের এই ঔদ্ধত্যকে জব্দ করার জন্য তিরস্কৃত করে বলেন, “আমার নিষেধ সত্ত্বেও তোমার স্পর্ধা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। তথাপি তুমি যখন গুরুদক্ষিণা দিতেই চাও, তবে কৃষ্ণকর্ণযুক্ত এমন আটশো অশ্ব প্রদান কর, যাদের গাত্রবর্ণ চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র।” অত্যন্ত কঠিন এই শর্ত। কোথায় পাবে সে এমন বিরল অশ্ব? কিন্তু সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যখন, তখন গুরু বিশ্বামিত্রকে যেমন করেই হোক তাকে ঐ অশ্ব প্রদান করতেই হবে। কিন্তু এই স্বল্প সময় কি ভাবে সে জোগাড় করবে অত অশ্ব?

সময় দরকার। সে করজোড়ে বলে, “আচার্য্য, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কৃপা করে আমায় কিছু সময় প্রদান করুন যাতে আমি আমার গুরুদক্ষিণা প্রদানে সমর্থ হই। সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত না হই।” বিশ্বামিত্র স্বীকৃত হন সময় দিতে।

সময় খুব কম, এই সময়ের মধ্যে অতগুলি অশ্ব জোগাড় করতে না পারলে গালব সত্যভ্রষ্ট হবে। সে সর্বদা চিন্তামগ্ন হয়ে থাকে। তার একান্ত প্রিয়বন্ধু ছিলেন গরুড়। গরুড়, গালবকে এমন বিষন্ন, চিন্তামগ্ন দেখে জানতে চায় “বন্ধু কি ক্লেশ বল আমায়। তুমি সর্বদা এত চিন্তমগ্ন থাক কেন?” গালব, গরুড়কে সব খুলে বলেন। গরুড় বিষ্ণুর কাছ থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে গালবকে পিঠে বসিয়ে নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে। উদ্দেশ্য আটশ বিরল অশ্ব জোগাড় করা। কিন্তু অনেক খুঁজেও এমন কোন অশ্ব তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অতঃপর গালব নিরাশ হয়ে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। গরুড়, গালবকে বিরত করে বলে, “প্রিয়বন্ধু, আত্মহত্যা মহাপাপ। এখনি আশাহত হয়ো না। রাজা যযাতির কাছে চল, শুনেছি, তার মত প্রজাপালক, হিতৈষী, পরোপকারী রাজা ভুপৃষ্ঠে কমই আছে। তার কাছে কোনকিছু চেয়ে পায়নি এমন ঘটনা বিরল। তাঁর অদেয় কিছুই নেই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস তিনি তোমাকে কোন না কোনভাবে সাহায্য করবেন।”

গরুড়ের বাণী, গালবকে নতুন করে আশা জোগায়। দুজনে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানপুরে এসে উপস্থিত হন। বিষ্ণুবাহন গরুড় ও ব্রাহ্মণপুত্র গালবের আগমনবার্তা পেয়ে যযাতি যথোপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শনপুর্বক আগমনের কারণ জানতে চাইলে গরুড় বলেন, “হে রাজন, এই ধরাধামে আপনার মত উপযুক্ত, প্রাজ্ঞ, প্রজাবৎসল, অতিথিপরায়ন রাজন খুব কমই আছে। আমার এই মিত্র গালব বিশ্বামিত্রমুনির প্রিয়তম শিষ্য। গুরুগৃহে শিক্ষা ও দীক্ষান্তে গুরুদক্ষিণাদানের প্রসঙ্গে গুরু-শিষ্য সংঘাত এমন স্থিতিতে এসে অবস্থান করছে যে আপনার কৃপা ও সাহায্য ব্যতীত তার সমাধান সম্ভব নয়। গুরুদক্ষিণাবাবদ গালবকে এমন আটশো অশ্ব প্রদান করতে হবে, যাদের কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ আর দেহ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র। হে রাজন আপনি অনুগ্রহপুর্বক এমন আটশো অশ্ব প্রদান করে আমার মিত্রকে সত্যভ্রষ্ট হওয়া থেকে বিরত করুন। আমি জানি এই সামান্য কার্য আপনার মত রাজনের কাছে অতিশয় সহজ।” সামান্য বিরতি নিয়ে পুনরায় গরুড় বলেন, “হে রাজন, আমার মিত্র গালব ব্রহ্মতেজী ব্রাহ্মণ, ভবিষ্যতে এর দ্বারা আপনার বহুবিধ হিতসাধন সম্ভব হবে। আপনার পরম সৌভাগ্য যে, গালবের মত একজন সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, পরম বিদ্ববান ব্রহ্মতেজী ব্রাহ্মণ আপনার নিকট যাচকের রূপে আবির্ভুত হয়েছেন। এঁনাকে সাহায্য করে আপনার মহানতা প্রমান করার এই সুযোগ আপনি হারাবেন না।”

গরুড়ের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে যযাতি বেশ সমস্যায় পরে গেলেন। সম্প্রতি রাজসূয় আর অশ্বমেধ যজ্ঞে তিনি নিজের সমস্ত অর্থভান্ডার উজাড় করে দিয়েছেন। এক্ষনে আটশো বিরল অশ্ব ক্রয় করবার মত অর্থও ভান্ডারে নেই। অথচ গরুড় যে আশা নিয়ে গালবকে তার কাছে নিয়ে এসেছেন, তাতে তাকে সাহায্য না করলে তিনি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবেন না। আবার ব্রহ্মতেজী ব্রাহ্মণের শাপও লাগতে পারে। অনেকক্ষণ চিন্তাভাবনা করার পর তার কন্যা মাধবীর কথা মনে পড়ল। ত্রিলোক সুন্দরী মাধবী দৈবগুনসম্পন্না ছিলেন। দৈবগুণ অনুসারে মাধবীর দ্বারা ভারত ভুখন্ডে এমন চারটি বংশের প্রতিষ্ঠা হবে যারা ভবিষ্যতে ইতিহাস নির্মাণ করবে। কিন্তু তথাপি তার কুমারীত্ব আর দৈহিক সৌন্দর্য্য অম্লান থাকবে।

সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। তিনি কন্যা মাধবীকে ডেকে গালব ও গরুড়ের হাতে সমর্পণ করে বললেন, "হে ঋষি গালব, বর্তমানে আমি এমন পরিস্থিতিতে নেই যে আপনার ঈপ্সিত আটশো অশ্ব আমি আপনাকে প্রদান করি। তাই আমি আমার এই ত্রৈলোক্য সুন্দরী কন্যাকে প্রদান করছি। শুল্কস্বরূপ একে বিশিষ্ট রাজাদের কাছে গচ্ছিত রেখে আপনি আটশো অশ্ব অনায়াসেই আহরণ করতে পারবেন। কিন্তু অশ্বপ্রাপ্তির পরই আপনি আমার কন্যাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।" অতঃপর যযাতির কন্যা মাধবীকে নিয়ে গরুড় ও গালব প্রথমে অযোধ্যার রাজা হরয়শ্বের দ্বারস্থ হলেন। রাজা হরয়শ্ব্য (মতভেদে হর্ষ)ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, পরদুঃখকাতর, সমৃদ্ধশালী রাজা। সেই সঙ্গে তিনি তেজস্বী নির্বাচিত সুবিশাল অশ্বশালার জন্যও বিখ্যাত ছিলেন। গালবকে তার উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে গালব তাঁকে সবিশেষ সবকিছু জানান। মাধবীর কূল-শীল -গুণ সবকিছু বর্ণন করেন ও মাধবীকে কররূপে গচ্ছিত রেখে আটশো বিরল অশ্ব যাচনা করেন। কিন্তু রাজা হরয়শ্বের সুবিশাল অশ্বশালায় মাত্র দুশোটি কৃষ্ণকর্ণ -চন্দ্রবদনা অশ্বই ছিল। রাজা মাধবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বললেন, "হে ঋষি গালব, আমি আপনাকে দুশোটির বেশি অশ্ব প্রদান করতে অপারগ। আপনাকে আমার সমান মর্যাদাযুক্ত কোন রাজনের কাছ থেকে বাকি অশ্ব জোগাড় করতে হবে। আমি মাধবীর কাছ থেকে একটি পুত্রপ্রাপ্ত হলেই খুশি হব। ততদিনের জন্য মাধবী আমার রাজপ্রাসাদ আলোকিত করবে। পুত্রপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই মাধবীকে আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।" গালব আর গরুড় সম্মত হলেন। দুশো অশ্বপ্রাপ্ত হলেন গালব। বেশ কিছুদিন পর হরয়শ্বের ঔরসে সর্বগুণ সম্পন্ন বসুমনা নামে এক পুত্রের জন্ম দিলেন মাধবী। পরবর্তীকালে এই বসুমনা অযোধ্যার একজন প্রসিদ্ধ রাজা হয়েছিলেন।

সময় অতিক্রান্ত, গালব আর গরুড় রাজার দরবারে গিয়ে মাধবীকে ফিরিয়ে নিয়ে হাজির হন কাশীরাজ দিয়োদাসের (মতভেদে দিবোদাস) দরবারে। সেখান থেকেও দুশোর বেশি অশ্বপ্রাপ্তি হয় না মাধবীকে কররূপে গচ্ছিত রেখে। সময় অতিক্রান্ত হলে মাধবীর গর্ভে দিয়োদাসের পুত্র প্রতর্দনের জন্ম হয়। কালে সে কাশীরাজ্যের পুনরুদ্ধারক হয়েছিল।

এবার মাধবীকে নিয়ে ভোজরাজ উশীনরের দরবারে হাজির হন গরুড় ও গালব। দৈবশক্তিবলে মাধবীর রূপ আর যৌবন কিছুতেই ম্লান হয় না। উশীনরের দানশীলতা ছিল পৃথিবী প্রসিদ্ধ। সেই সঙ্গে তার বিশাল ধনসম্পদও ছিল উশীনরের দরবারে হাজির হবার কারণ। মাধবীকে দেখে উশীনরের কামনা জাগ্রত হয়ে উঠল। তিনি তার অশ্বশালা থেকে দুশোটি অশ্ব মাধবীর পরিবর্তে গালবকে দিলেন এবং পুত্র শিবি উৎপন্ন হল তাদের সঙ্গমে। এই শিবির দানশীলতা পৃথিবীখ্যাত।

মোটা ছয়শোটি কৃষ্ণকর্ণ-চন্দ্রবদন অশ্বের প্রাপ্তির পর আর কোন ঐরূপ অশ্ব পৃথিবীতে ছিল না। অতএব গরুড়ের পরামর্শে গালব ঐ ছয়শোটি অশ্ব আর মাধবীকে নিয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, "হে আচার্য্য, আপনার আদেশানুসারে, আমি ছয়শোটি শ্যামকর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় গাত্রবর্ণের অশ্ব জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছি। ধরিত্রীতে আর একটিও এমন বিরল অশ্ব নেই যা আমি আপনাকে নিবেদন করতে পারি। বাকি দুশোটি অশ্বের পরিবর্তে করস্বরূপ মাধবীকে গ্রহন করলে আমার গুরুদক্ষিণা পূর্ণ হবে। কৃপা করে আপনি মাধবীকে গ্রহন করুন।" বিশ্বামিত্র পুর্বেই মাধবীর সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি মাধবীকে গ্রহন করলেন। তাঁর ঔরসে মাধবীর গর্ভ হতে জন্ম নিলেন বিশ্বামিত্রের পুত্র অষ্টক। অষ্টক পিতা বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে বিশ্বামিত্রের ফেলে আসা রাজ্যের শাসনভার গ্রহন করলেন আর ঐ ছয়শো কৃষ্ণকর্ণ-চন্দ্রবদন অশ্বের অধিকারীও উনিই হলেন।

চারটি যশস্বীপুত্রের জন্মদানে শেষ হল মাধবীর কর্তব্য যার জন্য সে জন্ম নিয়েছিল। চারটি পুত্রের জন্ম দেবার পরও সে একইরকম রূপবতী রইল। গালব এবং গরুড় পুর্বপ্রতিশ্রুতিমত তাকে পিতা যযাতির কাছে ফিরিয়ে দিল।
যযাতি এবার কন্যার স্বয়ংবর সভার আয়োজনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে মাধবী বিবাহ করতে অস্বীকৃত হয়। তার কর্তব্য সমাধান হয়েছিল তাই সে তপশ্চর্যার মাধ্যমে বাকি জীবন অতিবাহিত করার ইচ্ছা প্রকট করেন। রাজা যযাতির অনুমতিক্রমে মাধবী তপোবনে গমন করেন।

এটি একটি রূপক আখ্যানের বর্ণনা যা মহাভারতে আছে। সেখানে 'বিশ্বামিত্র-গালব' উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে গালব ছিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য। তিনি শিক্ষা ও সাধনার অন্তে দক্ষিণা দিতে চাইলে বিশ্বামিত্র অতি অদ্ভুত রকমের আটশত অশ্ব চেয়ে বসলেন। নিরুপায় গালব প্রথমে কাশীশ্বর যযাতির নিকট প্রার্থী হন। কিন্তু যযাতি প্রার্থিত অশ্ব দিতে অসমর্থ হওয়ায় কন্যা মাধবীকে গালবের হাতে সমর্পণ করেন।

গালিব মাধবীকে পর পর তিনজন রাজার সঙ্গে (অযোধ্যার রাজা হর্ষ, কাশীর রাজা দিবোদসি এবং ভোজরাজ উশীনর) বিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিনিময়ে প্রত্যেকের নিকট হতে বিশ্বামিত্রের চাহিদা অনুযায়ী দুইশত করে অশ্ব শুল্ক হিসাবে গ্রহণ করেন। সেই তিনজন রাজার প্রত্যেকেই মাধবীর গর্ভে একটি করে পুত্র উৎপাদন করে সেই পুত্রকে কাছে রেখে অশ্বসমেত মাধবীকে প্রত্যার্পণ করেছিলেন বলেই এইরকম অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল। তিন রাজার নিকট হতে প্রাপ্ত ছয়শত অশ্ব এবং বাকী দুইশত অশ্বের পরিবর্তে মাধবীকে বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করে গালর গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করেছিলেন। অবশ্য বিশ্বামিত্রও মাধবীতে একটি পুত্রোৎপাদন করে তাঁকে গালবের হাতে ফেরত দেন, গালবও প্রয়োজন সিদ্ধির অন্তে যযাতির নিকট তার কন্যাকে প্রত্যার্পণ করেন। এই আখ্যান বর্ণিত মাধবীকে যতক্ষণ মানবীয় জীব এবং রক্তমাংসের দেহ বিশিষ্ট নারী বা কন্যা মনে করা যায় ততক্ষণ আখ্যায়িকাটিকে সম্পূর্ণ উদ্ভট, এমনকি এক গঞ্জিকাসেবীর আষাঢ়ে গল্প বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যখনই জানা যায় যে মাধবী বস্তুতঃ একটি ধর্মমতের বা ধর্মীয় মতবাদের স্ত্রী বা কন্যারূপ মাত্র, তখন গল্পটির মধ্যে ন্যক্কারজনক কোন কিছু ত থাকেই না বরং মনে হয় যে,তিনজন রাজা এবং একজন ঋষি ত ভাল কথা, পঁচিশজন রাজা এবং পঞ্চাশজন ঋষির হস্তেও মাধবীকে সমর্পণ করতে পারতেন; বিষ্ণুর অপর নাম যে মাধব, একথা সকলেরই জানা। মাধবী হলেন বিষ্ণুভক্তির প্রতীক বিষ্ণুর শক্তিসত্ত্বা। একথা মনে রাখতে হবে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মমন্ত্র গায়ত্রীর দ্রষ্টা। তাঁর শিষ্য গালবও অথর্ববেদের বহু মন্ত্রের দ্রষ্টা এবং পরম বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণুভক্তির পরাকাষ্ঠা রচনা করে বিষ্ণুর আরব্ধ কর্ম চারটি বিষ্ণু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত নিয়েই মাধবীর মর্ত্যলোকে অবতরণ। গালব রাজকন্যা মাধবীকে তিনজন রাজা এবং একজন ঋষির হস্তে সমর্পণ করার তাৎপর্য হল, তিনজন প্রসিদ্ধ প্রভাবশালী রাজা এবং বিশ্বামিত্রের মত মহর্ষিও বিষ্ণুভক্তি অর্থাৎ সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্যের উপাসনার ধারাকে গ্রহণ, প্রবর্তন ও প্রচার করেছিলেন। এইভাবে পুরাণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গ্রহণ করা উচিৎ, নির্বিচারে প্রতিটি অক্ষরকে বিশ্বাস না করে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি আখ্যান মহাভারতের ঋষি-কবি বেদব্যাস দ্রৌপদীর জন্ম বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রোণের শত্রুতাচরণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞাগ্নি হতে দ্রৌপদীর উদ্ভব হয়। যজ্ঞ হতে উৎপন্ন বলে দ্রৌপদীর আর এক নাম যাজ্ঞসেনী। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন মৎস্যচক্র ভেদ করে দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হন এবং মাতা কুন্তীর আদেশে পঞ্চপাণ্ডব একসঙ্গে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। পাঁচ ভাই

একত্রে কেমন করে একটি মাত্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে লাগলেন এবং কুন্তীই বা কি করে এইরকম একটা অসামাজিক অশোভন এবং উদ্ভট প্রস্তাব করতে পেরেছিলেন–এই জাতীয় নানা প্রশ্ন পরবর্তীকালের মানুষের মনে জাগবে বলেই মহাভারতের মধ্যে মৎস্যচক্রে যৌগিক ব্যাখ্যাসহ আরও নানারকম ব্যাখ্যা সম্বলিত অভিনব ঘটনার প্রক্ষেপ বা সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু যে সময়ে মূল মহাভারত রচিত হয়েছিল সেই যুগের মানুষ পুরাণের কাহিনীকে রূপক আখ্যান হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁরা জানতেন ঋষিরা কোন বিশেষ শিক্ষা বা ধর্মনীতিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলবার জন্য এইরকম রূপকের আশ্রয়ে মনোজ্ঞ গল্প রচনা করতেন। সেই যুগের মানুষের মানসিকতাই এইরকম ছিল যে পঞ্চ পাণ্ডবের এক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে বা কুন্তীর ওইরকম উদ্ভট আদেশে বিচলিত হন নি। কারণ নিঃসংশয়ভাবে তাঁরা জানতেন যে যাজ্ঞসেনী বা দ্রৌপদী নাম্নী মহাভারতের স্ত্রী চরিত্রটি উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রচলিত ধর্মমতের স্ত্রী বা কন্যারূপ মাত্র–যার মধ্যে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞীয় মতবাদই প্রধানতম উপাদান ছিল।

বস্তুতঃ দ্রৌপদী আখ্যায় আখ্যাত নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে মহাভারতকার প্রধানভাবে যজ্ঞধর্মের (যার নামান্তর বৈদিক ধর্ম) ইতিবৃত্তি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের চেষ্টা করেছিলেন বলেই তার আর এক নাম দিয়েছিলেন 'যাজ্ঞসেনী।' যজ্ঞে যজমান ছাড়াও পাঁচজন সাধারণত অংশগ্রহণ করেন–হেতি, উদগাতা, ব্রহ্মা,অধ্বর্য এবং ঋত্বিক। এই পাঁচজনই পঞ্চপাণ্ডব এবং যজ্ঞাগ্নি বা অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিধিই দ্রৌপদীর রূপকে গল্পের মাধ্যমে মহাভারতে পরিবেশিত হয়েছে।

গল্পাংশের গভীরে প্রবেশ করে তার তাৎপর্য মনন করলে পুরাণের ফেনানো গল্পের মধ্যেই অনেক সত্যকে আবিষ্কার করা যায়। মেধা ও মননশক্তি দ্বারা সারং ততো গ্রাহামপ্রস্য ফন্তুং–অর্থাৎ অসার অংশ ডাল পালা বাদ দিয়ে সার বস্তু গ্রহণের কৌশল এমনই । এরকমই আরেকটা উদাহরণ স্বরূপ পরশুরামের কথাই বলছি।

তিনি ১১২০ বৎসরের অধিককাল বেঁচেছিলেন এ কথা ভক্ত সরল বিশ্বাসী ছাড়া আর কারও পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি পরশুরামকে একটি ধর্মমত বা একটি বিশিষ্ট পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যবাহী ধারা বলে ধরা হয়, তাহলে পরমের অনুবর্তী পরশুরামগণের পক্ষে সহস্রাধিক বৎসর বেঁচে থাকতে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ কোন ধর্মমতের তথা ধর্মসম্প্রদায়ের পরমায়ু সহস্র বৎসর হতে কোন বাধা নেই।

আধুনিক কালের কোন লেখক যদি খ্রীষ্টধর্মের বা ইসলাম ধর্মের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে লেখেন যে–খ্রীষ্টের বা হজরত মহম্মদের বয়স যথাক্রমে ২০০০ ও ১৪০০ বৎসর হয়েছে, তাহলে এযুগের লোকদের মনে যেমন কোন সন্দেহ বা বিস্ময়ের সঞ্চার হবে না–সেকালেও তেমনি পরশুরাম রাবণ নারদ প্রভৃতির দীর্ঘজীবিতায় কেউ কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করবেন না। কারণ, তাঁদের প্রত্যেকেই যে এক একটি ধর্মমত বা পূর্বাপর ঐতিহ্যের ধারক মাত্র, তা সকলে ভালভাবেই বুঝতে পারবেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পরশুরামের একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন বা নিঃশেষের গুঢ়ার্থ এই যে-পরশুরাম অর্থাৎ গুরুতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, কোন পক্ষ দ্বৈততন্ত্র, কোন পক্ষ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন। পরশুরাম ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিতন্ত্রের সঙ্গে পরশুরামগণের যে ধর্মযুদ্ধ চলেছিল তার ফলে বারবার ক্ষত্রিয় নিয়ন্ত্রণ–ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও বিলুপ্তি ঘটেছিল। এ ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য বলেই সেকালের পুরাণকাররা নানা রোমাঞ্চকর গল্পের মাধ্যমে বলে গেছেন যে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন।

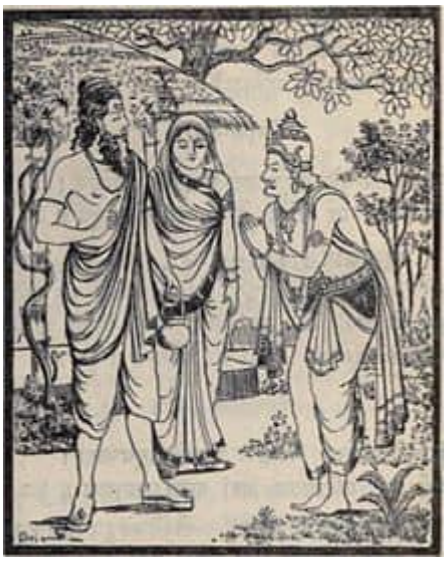

BANGL N.COM

॥ঋষি মার্কণ্ডেয়॥

কেন মনে হল ঋষি মার্কণ্ডেয়র কথা? কারণ শ্রীশ্রীচণ্ডী যে পাঠ করি বা নর্মদা মায়ের মাহাত্ম্য সবই দান এই মহাঋষির। কে ছিলেন ঋষি মার্কণ্ডেয়?

ঋষি ভৃগুর বংশে জাত প্রাচীনঋষি মার্কণ্ডেয় ছিলেন মার্কণ্ডেয় শিব ও বিষ্ণু উভয় দেবতারই এক বিশিষ্ট ভক্ত। একাধিক পুরাণে তার উল্লেখ রয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ঋষি মার্কণ্ডেয় ও জৈমিনীর কথোপকথনের আকারে রচিত। ভাগবত পুরাণ-এরও কিয়দংশ মার্কণ্ডেয়র কথোপকথন ও প্রার্থনার সংকলন। মহাভারতেও মার্কণ্ডেয়ের উল্লেখ রয়েছে। সকল মূল শাখার হিন্দু সম্প্রদায়গুলির কাছেই মার্কণ্ডেয় এক শ্রদ্ধেয় ঋষি।

বর্তমানে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলায় যমুনোত্রী মন্দিরের ট্রেকিং রুটে মার্কণ্ডেয় তীর্থ নামে একটি স্থান অবস্থিত। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এখানেই মার্কণ্ডেয় তার মার্কণ্ডেয় পুরাণ গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন।

পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে জানতে পারা যায় ঋষি মার্কণ্ডেয় সম্পর্কে প্রচলিত জনপ্রিয় এই উপাখ্যানটি: মৃকণ্ডু ঋষি ও তার পত্নী মরুদবতী পুত্রকামনায় শিবের আরাধনা করেন। তাদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব তাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তারা কেমন পুত্র চান–দীর্ঘজীবী মূর্খ পুত্র না ক্ষণজীবী জ্ঞানী পুত্র। মৃকণ্ডু ঋষি ক্ষণজীবী জ্ঞানী পুত্রই চান। জন্ম হয় মার্কণ্ডেয়ের।

মার্কণ্ডেয়ের আয়ু ছিল মাত্র ষোলো বছরের। সে ছিল শিবের ভক্ত। ষোড়শ বছরে পদার্পণ করার পর যখন তার মৃত্যুকাল আসন্ন, তখন সে একটি শিবলিঙ্গ গড়ে পূজায় বসে। যম তাকে নিয়ে যেতে এলে সে সেই শিবলিঙ্গ ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে। যম তার রজ্জু দিয়ে মার্কণ্ডেয়কে বন্ধন করলে, মার্কণ্ডেয় শিবলিঙ্গটিকে আঁকড়ে ধরে রইলেন এবং শিবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকেন। ভক্তবৎসল শিব ভক্তের দুর্দশা দেখে শিবলিঙ্গ থেকে আবির্ভূত হলেন । ক্রুদ্ধ শিব আক্রমণ করলেন যমকে। যম পরাভূত হন এবং মার্কণ্ডেয়ের উপর তার দাবি ত্যাগ করে ফিরে যান। শিব যমকে পরাজিত করে মৃত্যুঞ্জয় নামে পরিচিত হন। শিবের বরে মার্কণ্ডেয় অমরত্ব লাভ করেন।

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র মার্কণ্ডেয়ের রচনা মনে করা হয়। তামিলনাড়ুর তিরুক্কদাভুর মন্দিরে শিবের যমবিজয়ের ধাতুচিত্র রয়েছে। নৃসিংহ পুরাণ গ্রন্থেও একই প্রকার একটি কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই কাহিনি অনুযায়ী, মার্কণ্ডেয় কর্তৃক মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠের পর বিষ্ণু যমের হাত থেকে মার্কণ্ডেয়কে রক্ষা করেছিলেন।

ভাগবত পুরাণের উপাখ্যান

ভাগবত পুরাণ গ্রন্থে উল্লিখিত কাহিনি অনুসারে, সমগ্র বিশ্ব জলময় হলে মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর স্তব করে তাকে উদ্ধার করার আবেদন জানান। বিষ্ণু পাতায় ভাসমান একটি বালকের বেশ ধরে এসে তাকে বলেন যে তিনিই সময় ও মৃত্যু। বালক ঋষিকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন নিজেকে ক্রমবর্ধমান জলরাশি থেকে উদ্ধার করতে বালকের মুখে প্রবেশ করেন। বালকের উদরে প্রবেশ করে সেখানে মার্কণ্ডেয় বিশ্বচরাচর, সপ্তলোক ও সপ্ত মহাসমুদ্রের উপস্থিতি দেখতে পান। সকল পর্বত, রাজ্য ও জীব সেখানে বিদ্যমান ছিল। উদভ্রান্ত হয়ে মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর স্তব

করতে থাকেন। সেই মুহূর্তেই বালকের মুখের বাইরে বেরিয়ে আসেন মার্কণ্ডেয় । বিষ্ণু তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাকে বর দেন। মার্কণ্ডেয় বালকরূপী বিষ্ণুর উদরে এক হাজার বছর কাটিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি বালমুকুন্দাষ্টকম্ স্তোত্র রচনা করেন।

দেবীমাহাত্ম্য

শাক্তধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ দেবীমাহাত্ম্যম্ মার্কণ্ডেয় পুরাণ গ্রন্থের অংশবিশেষ। আমাদের অতি পরিচিত গ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীও মার্কণ্ডেয় ঋষির রচনা যা দেবীমাহাত্ম্যম্ এর অংশ বিশেষ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ সম্ভবত হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম পুরাণগ্রন্থগুলি অন্যতম। এই পুরাণের রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু (বিশেষত প্রথম দিকের অধ্যায়গুলি) হিন্দু মহাকাব্য মহাভারতের পরিশিষ্টের আকারে রচিত। সেই কারণে গবেষকেরা এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দিহান হয়েছেন এবং এটিকে মহাভারতের ঠিক পরের রচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

গবেষক ওয়েন্ডি ডনিগারের মতে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল আনুমানিক ২৫০ খ্রিস্টাব্দ হলেও চণ্ডী অংশটি আনুমানিক ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের রচনা। অন্যান্য গবেষকদের মতে, এই পুরাণের কিয়দংশ খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল। অপরপক্ষে গবেষক নীলেশ্বরী দেশাই মনে করেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুঁথিটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত হয়।

এই পুরাণটির রচনাকাল নির্ধারণে বিশেষভাবে সাহায্য করে অভিলিখন-সংক্রান্ত প্রমাণগুলি। উদাহরণস্বরূপ, ৬০৮ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ দধিমতী মাতা অভিলিখনটিতে চণ্ডী গ্রন্থের দশম অধ্যায় (মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৯১শ অধ্যায়) থেকে একটি উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এর থেকে অনুমিত হয় যে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকেই এই পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। নেপাল থেকে পুরাণটির ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে লিখিত একটি পূর্ণাঙ্গ তালপাতার পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভবভূতি রচিত মালতীমাধব গ্রন্থে চণ্ডী গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে অনুমিত হয়, উক্ত সময়ের মধ্যেই গ্রন্থটি প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল এবং প্রচারিতও হয়েছিল। অন্যান্য গবেষকদের মতে, এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনও এক সময়। জন লকটেফেল্ডের মতে, চণ্ডীতে পরমসত্ত্বা হিসেবে দেবীর ধারণাটির পরিপূর্ণ রূপ দেখে অনুমিত হয় চণ্ডী গ্রন্থের রচনার আগে থেকে অথবা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেই প্রচলিত হয়।

অন্যান্য পুরাণগুলির মতো মার্কণ্ডেয় পুরাণের কালপঞ্জিও বেশ জটিল। ডিম্মিট ও এ. বি. ভ্যান বুটেনেনের মতে, প্রতিটি পুরাণই শৈলীগত দিক থেকে বিশ্বকোষতুল্য বলে কবে, কোথায়, কেন ও কে এইগুলি রচনা করে তা নিশ্চিত করা কঠিন।

অধুনা লভ্য পুরাণগুলি স্তর অনুযায়ী বিন্যস্ত সাহিত্য। শিরোনাম-যুক্ত প্রত্যেকটি রচনা আনুক্রমিক ঐতিহাসিক যুগগুলিতে অসংখ্য সংযোজনের মাধ্যমে বর্ধিত উপাদান-সমৃদ্ধ। এই কারণে কোনও পুরাণেরই একটি নির্দিষ্ট রচনাকাল নেই। (...)এগুলি দেখে মনে হয় যেন এগুলি এক-একটি গ্রন্থাগার যেখানে গ্রন্থের নতুন নতুন খণ্ড ক্রমাগত যুক্ত হয়ে চলেছিল। তবে এই সংযোজন বইয়ের তাকের শেষ প্রান্তে করা হয়নি, করা হয়েছিল এলোমেলোভাবে।

–কর্নেলিয়া ডিমিট ও জে. এ. বি. ভ্যান বুইটেনেন, ক্ল্যাসিকাল হিন্দু মিথোলজি: আ রিডার ইন সংস্কৃত পুরাণস।

রচনাস্থল

চণ্ডী অংশটি সহ মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রাচীনতম পাঠটি সম্ভবত পশ্চিম ভারতে নর্মদা-তীরবর্তী কোনও অঞ্চলে রচিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৩৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে ৮১শ থেকে ৯৩শ অধ্যায় পর্যন্ত অংশটি চণ্ডী নামে পরিচিত। গ্রন্থের সূচনায় দেখা যায় মীমাংসা দর্শনের প্রবক্তা জৈমিনী ঋষি মার্কণ্ডেয়কে মহাভারত-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন করছেন। মার্কণ্ডেয় সেই প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়ে বলেন যে তাঁকে কয়েকটি বৈদিক অনুষ্ঠান পালন করতে হবে এবং জৈমিনী যেন বিন্ধ্য পর্বতে বসবাসকারী চার জ্ঞানী পক্ষীকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করেন। ঋষি জৈমিনী বিন্ধ্য পর্বতে গমন করেন। এরপর পক্ষীদের উত্তর মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৪র্থ থেকে ৪৫শ অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে।এই আলোচনার মধ্য দিয়ে পুরাণকথা-সহ নৈতিক উপদেশ, মহাভারত ও গৌতম ধর্মসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে গৃহীত কর্ম, সংসার, ধর্ম ও শ্রদ্ধা ইত্যাদির তত্ত্ব বিবৃত হয়েছে।

৩৯শ থেকে ৪৩শ অধ্যায় পর্যন্ত যোগ দর্শন আলোচিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, পূর্বতন কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে এবং আত্মজ্ঞান ও মোক্ষ লাভ করতে এই দর্শনই হল পথ। রিগোপলোসের মতে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে যোগ দর্শনের আলোচনা, দত্তাত্রেয়ের চিত্রণ ও তাঁর যোগশিক্ষা মূলগতভাবে জ্ঞানযোগের শিক্ষা এবং অদ্বৈতবাদী ধারায় জ্ঞানের উপর এই গুরুত্বারোপ সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে দত্তাত্রেয়র বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এম. টি. সহস্রবুদ্ধের মতে, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, নারদপুরাণ ও কূর্মপুরাণের মতো মার্কণ্ডেয় পুরাণেরও সাধারণ ভিত্তিটি "অভ্রান্তভাবে অদ্বৈত", যা সম্ভবত আদি শংকরের পূর্ববর্তী সময়ের অদ্বৈতবাদকে প্রতিফলিত করে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে চার পক্ষীর সহিত ঋষি মার্কণ্ডেয়র কথোপকথন বিবৃত হয়েছে। তবে ৪৫শ-৮০শ ও ৯৪শ-১৩৭শ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ই প্রধান বক্তা। গবেষকেরা মনে করেন, এই অংশটিই মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রাচীনতম অংশ বলে এখানে শৈলীগত এই পরিবর্তন ঘটেছে। এই অংশে রয়েছে বংশলতিকা, মন্বন্তর, ভূগোল ও হিন্দু দেবতা সূর্যের মাহাত্ম্যসূচক কয়েকটি অধ্যায়।

দেবীমাহাত্ম্যম

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১শ থেকে ৯৩শ অধ্যায়গুলি পৃথক গ্রন্থাকারে চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্যম্ নামে পরিচিত। এটি শক্তি রূপে দুর্গা বা চণ্ডীর মাহাত্ম্যকীর্তনকারী প্রধান ভক্তিমূলক শাস্ত্রগ্রন্থ। এই গ্রন্থের অপর নাম চণ্ডীমাহাত্ম্য বা দুর্গাসপ্তশতী। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা এবং বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে এই গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়।

চণ্ডী গ্রন্থের সূত্রপাত ঘটেছে যুদ্ধে পরাজিত ও বনে নির্বাসিত রাজা সুরথের কিংবদন্তির মধ্যে দিয়ে। সেই বনে সমাধি নামে এক বৈশ্যও স্ত্রীপুত্র কর্তৃক সম্পত্তিচ্যুত হয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটলে দু'জনেই আবিষ্কার করেন যে, যাঁরা তাঁদের বিতাড়িত করেছিল তাঁদেরই অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁদের মন উদ্বিগ্ন হচ্ছে। ঋষি

মেধাকে (সুমেধা) এই দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ঋষি উত্তর দেন, এটিই মহামায়ার লীলা। ক্ষুধার্ত পক্ষী নিজে অভুক্ত থেকেও সংগৃহীত বীজ নিজ সন্তানের মুখে তুলে দেয়। ঋষি মেধা এই ঘটনাকে দেবীর মায়াশক্তি বা প্রকৃতি বলে উল্লেখ করে বলেন, সর্বত্রই দেবীর প্রকাশ এবং তিনিই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করেন, আবার মুক্তিদানও করেন। সুরথ ও সমাধি দেবীর বিষয়ে আরও জানতে চাইলে ঋষি মেধা মধুকৈটভ বধের উদ্দেশ্যে মহামায়া কর্তৃক বিষ্ণুর যোগনিদ্রাভঙ্গ এবং দেবী কর্তৃক মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় বধের আখ্যান বর্ণনা করেন। চণ্ডী গ্রন্থে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তিতে দেবীর বর্ণনা প্রদানের মাধ্যমে ঈশ্বরের মাতৃরূপের স্বরূপটি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথ্যাবলী

মার্কণ্ডেয় পুরাণ সমাজ, ধর্ম ও পুরাণকথা-সহ বিষয়বৈচিত্র্যে সুসমৃদ্ধ। এই পুরাণের অধ্যায়গুলি থেকে প্রাচীন ভারতের পরিবার, বিবাহ, সামাজিক জীবন, পোষাকপরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, প্রথা, অনুষ্ঠানাদি, পরিমাপ প্রথা, সামাজিক রীতিনীতি, নারীর মর্যাদা, সৃষ্টিতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, ভূগোল, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়। পৌরাণিক কাহিনি ও ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থটিকে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ বিষয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস মনে করা হয়।

প্রভাব

লুই ই. ফেনেক ও ডব্লিউ. এইচ. ম্যাকলিওডের মতে, শিখ দশম গ্রন্থের অন্তর্গত চণ্ডী চরিতর উক্তি বিলাস একটি অপ্রধান ধর্মগ্রন্থ এবং সেটির মূল উৎস মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

দেবীমাহাত্ম্যম্ অংশটি দুর্গাপূজা-সহ শাক্ত উৎসবে এবং বিভিন্ন দেবীমন্দিরে পঠিত হয়ে থাকে।

সংস্করণ

মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রথম তিনটি মুদ্রিত সংস্করণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংস্করণটি ১৩৬শ অধ্যায়ে দমের উপাখ্যানটি অসমাপ্ত রেখেই আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে। বোম্বাই ও পুনা থেকে প্রকাশিত সংস্করণ দু'টিতে ১৩৭শ অধ্যায়ে দমের উপাখ্যানটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ একাধিকবার ইংরেজিতেও অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে সি. সি. মুখোপাধ্যায় (১৮৯৩) ও এফ. ই. পার্জিটার (১৯০৪) কৃত অনুবাদ দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য টমাস কোবার্নের মতে, পুরাণের অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্নির্মাণের দিকেই পার্জিটার অধিকতর মনোনিবেশ করেছিলেন। তাই এই অনুবাদটির প্রকাশনার পরে পার্জিটারের অনুবাদ ও সিদ্ধান্ত দুইই ব্যাপকমাত্রা বিতর্ক সৃষ্টি করে।

গ্রেগরি বেইলি ১৯৯১ সালে প্রকাশিত টমাস কোবার্ন কৃত দেবীমাহাত্ম্যম্-এর অনুবাদটিকে উৎকৃষ্ট বলে মতপ্রকাশ করেছিলেন।

মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে সপ্তকল্পজীবী বলা হয়, এই সপ্তকল্পগুলি হল মায়ূর, কৌম্য,পুর, কৌশিক, মাৎস, দ্বিরাদ ও বরাহ, এক এক কল্পের শেষে পৃথিবীর বুকে মহাপ্লাবন দেখা দিয়েছে–প্রলয়ের অবস্থা। সমগ্র সৃষ্টি যখন একাকার হয়ে গেছে তখন মা নর্মদা, যিনি সমগ্র সৃষ্টির ও সভ্যতার বিধাত্রী ও পালয়িত্রী দেবী, তিনি আশ্রয় দিয়েছেন মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে যা তপস্যা ভিন্ন বুদ্ধির দ্বারা অগম্য। এই নর্মদা তীরেই সুপ্রাচীন চেদিরাজ্য ছিল মহাভারতের যুগে যার রাজা ছিলেন শিশুপাল, মহাবীর রাবণজয়ী কার্তবীর্যার্জুনের মাহিষ্মতী নগরী ছিল এই নর্মদাতটে, প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসেরও সাক্ষী এই নর্মদাতট, প্রতিকল্পে যে স্থান মা নর্মদা ও শিবের তপোভূমি, লীলাক্ষেত্র।

গবেষকেরা আবিষ্কার করেছেন যে নর্মদাতটের তীরে তীরে যে সভ্যতা তা পাঁচ লক্ষ বছরের বেশী প্রাচীন সেই পুরাপুলীয় যুগের মানুষের হাতে তৈরী প্রস্তরাস্ত্র, ফলে নর্মদা তট পুরাপুলীয় মানব সভ্যতার এক বিশিষ্ট আধার। এই সপ্তকল্পের সাতটি কালেই নর্মদা মায়ের কৃপায় ও করুণায় রক্ষা পেয়েছে এই নর্মদা উপত্যকার আদি মানব সভ্যতা। পুরাপুলীয় যুগ থেকে টিকে থেকে পৌঁছেছে নবপলীয় যুগে। আদিম সেই সপ্তকল্প ধরে মানব সন্তান মার্কণ্ডেয়কে রক্ষা করেছিলেন একার্ণবে ভ্রমত্যেকা অমৃতনির্ঝরিণী অমৃতময়ী নর্মদা। তাই নর্মদা মায়ের কীর্তন করে উদাসী সাধু গান ধরেন কবীরজীর ভাষায়–

BANGL

বুঝ বুঝ পণ্ডিত পদ নিরবাণ।
সাঝ পর কহবা বসে ভান।
পর্বত ঢেলা না ইট।
বিনু গায়ন তহবা উঠে গীত।
চাহ প্যাস মন্দির মহি জহঁবা॥
সহস্রৌ ধেনু দুহাবে তঁহবা।
নিত অমাবস নিত সংক্রান্ত।
নিত নিত নবগ্রহ বেঁঠে পাত॥
মৈতো পুছৌ পণ্ডিত জন।
হৃদয়া গরহন লাগু কোনখানা।
কহহি কবীরা ইতনো নহি জান॥
কৌন শব্দ গুরু লাগায়া কাণ।

অর্থাৎ হে তত্ত্ব। নির্বাণ পদটি বুঝে গ্রহণ কর। সন্ধ্যা সমাগমে সূর্য কোথায় থাকেন বলতে পার? তথায় উচ্চ নেই নীচ নেই অর্থাৎ উচ্চনীচের ভেদাভেদজ্ঞান নাই, ইঁট নেই, পর্বত নেই। কেউ সেইখানে গান করছে না তথাপি সেখানে অণুক্ষন মহাসঙ্গীতের তরঙ্গ উঠছে। তথায় কোন মন্দির নেই, বিচারক নেই, তৃষ্ণা নেই অথচ তথায় সহস্র সহস্র গভীর যুগবৎ দোহন হচ্ছে। তথায় দেখি নিত্য অমাবস্যা বর্তমান, নিত্য পৌর্ণমাসীও বিরাজিত। নবগ্রহগুলি সেখানে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থান করছে। হে তত্ত্বজ্ঞ, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি-কখন, কোন ক্ষণে হৃদয়ের গ্রহণ উপস্থিত হয়? তুমি যদি এইটুকুও না জান, তাহলে গুরু তোমার কানে কোন্ মন্ত্র বা শব্দ প্রবেশ করালেন?

বুঝ বুঝ পন্ডৎ পদ নিরবাণ।
রেবা জপো, রেবা তপো, রোসে সব কুছ জান্।
সুরতিয়া সুরতিয়া সুরতিয়া হো॥
ঋষি অনির্বাণজীর কথায়:
যা করবে, শান্ত থেকে করবে। করবে নয়, হতে দেবে।
তুমি নিমিত্তমাত্র। যত ফাঁকা থাকতে পার।

আর করেই ভুলে যাবে, যেন তোমার করবার কিছু ছিল না, নাইও–ছোট বালিকার মত। জিহ্বার আরেক নাম রসনা। ওটি বাইরের রস গ্রহণ করে আবার ভিতরের রসও ছড়ায় বাকের সাহায্যে। রসনা যদি বৈরী হয় তাহলেই তো বিপদ। তখন নেওয়া আর দেওয়া দুটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। রসনা জীবনের মূলে, তার মোড় ফেরানো তো সোজা নয়। দেবী কাঞ্চনবর্ণা অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী। কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্ব এখানে সক্রিয়। রসকে আশ্রয় করে প্রতি মুহূর্তে যে সংঘাত বা সংসক্তির সৃষ্টি হচ্ছে, তিনি তা চূর্ণ করে দিচ্ছেন। আসলে ব্যাপারটা আহারশুদ্ধি এবং সত্ত্বশুদ্ধির। 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ।' দেবীর চরণস্পর্শে অসুরের রূপান্তরের শুরু হয় বটে, কিন্তু শেষ হতে দেরী লাগে। মহিষাসুর রূপান্তরিত হয় শুম্ভ-নিশুম্ভে। তারা হল নকল শিব। সোনা বটে, কিন্তু খাঁটি সোনা নয়। পেয়ে বারবার হারাতে হয়। হারাতে-হারাতে শূন্যতার একটা সংস্কার জন্মে যায়। তখন দেখি–সেই শূন্যতা হতে পূর্ণতার নিত্য উৎসারণ। শেষ এইখানেই। প্রকৃতি স্ফুরণের মুখে কুমারী। আবার ষোড়শীর ঊর্ধ্বে সপ্তদশী যখন তখনও কুমারী। দুটি ভাবের মাঝখানটায় সে জননী। জননীতে বিভূতির প্রকাশ। আর কুমারী হল সহজ এবং শূন্যতা। ভাগবতে সতী কুমারী। উমা কুমারজননী। ষোলকলার পনের কলা পর্যন্ত হ্রাসবৃদ্ধি আছে। ষোড়শীকলা নিত্যা। প্রাচীন গ্রন্থে রাধার এক নাম চন্দ্রাবলী–অর্থাৎ চাঁদের কলার পর কলা। কেউ তাকে ভালবাসে এক কলা দিয়ে, কেউ দু কলা দিয়ে ইত্যাদি। সবাই চাঁদের মেয়ে, সবাই ফুটছে, তবুও শক্তির তারতম্য আছে। পূর্ণ প্রকাশ ষোলকলায়। তাই রাধা। চন্দ্রাবলী পর্যন্ত ঘৃতস্নেহ, আর রাধাতে মধুস্নেহ। চন্দ্রাবলী আর কিছুই চাইল না। কিন্তু রাধা তাঁকে পায় বা চায় প্রতি রাত্রেই। ভক্তের জোর তখন ভগবানের চাইতেও বেশী। চৈতন্য পুরুষ, আর তার বিচ্ছুরণই প্রকৃতি। চৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধি হয় আপনাতে আপনি থাকলে। তখন শক্তির দুটি ক্রিয়া দেখা যায়–একটি ভিতরের দিকে টান, আরেকটি বাইরের দিকের বিকিরণ। দ্বিতীয়টিকে উপনিষদে বলা হয়েছে। ব্রহ্মক্ষোভ–সূর্যের মাঝে পারার মত জ্যোতির টলমল অবস্থা। ভিতরের দিকে যে টান, আর তাতে সে আত্মানন্দ, সেইটি কৌমারী শক্তি। শক্তি তখন কুমারী, জননী নন। বাইরের ক্ষোভ হল জনয়িত্রী শক্তি। দুয়ের মাঝখানে ভাবলোক। সেইখানে নিত্যরাস। তা কিন্তু কৌমারীশক্তিতে বিধৃত। তাই যোগমায়াকে আশ্রয় করে তাঁর রাস, গোপীদের যোগমায়াকে ভজনা।

Ravi Varma.
THE RAVI VARMA PRESS PICTURE DEPOT.
BOMBAY.

scorpion.aminus3.com

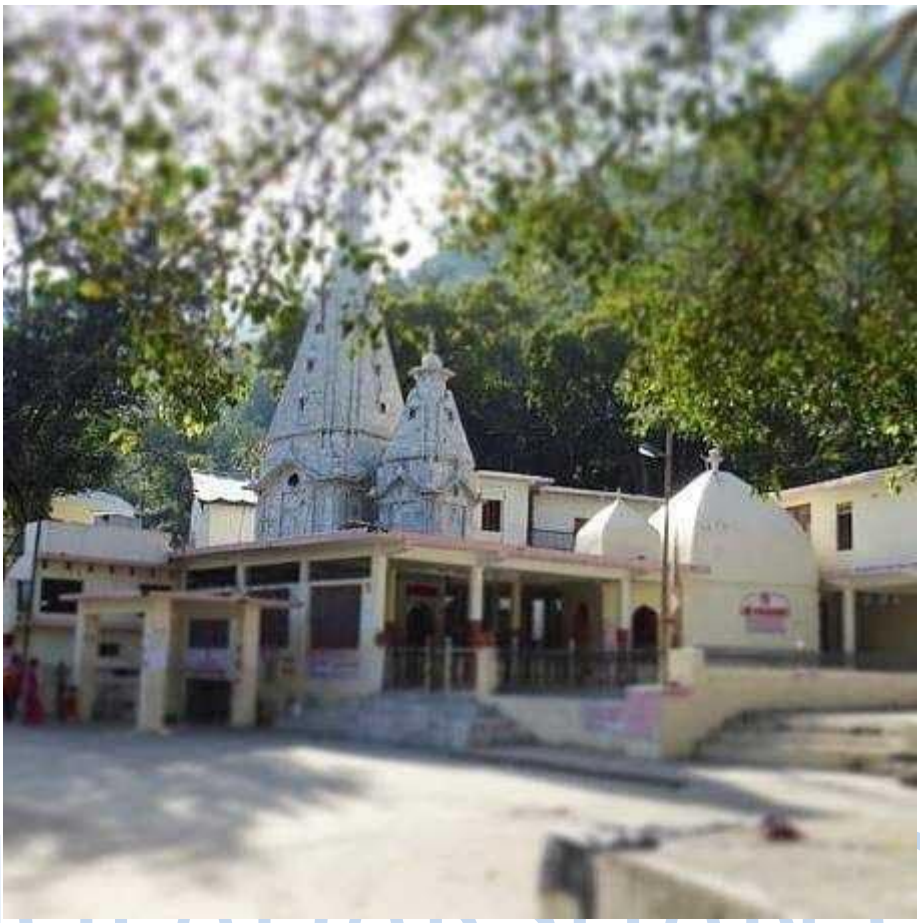

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥